POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

আল্লাহ্‌র বাণী

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ
بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى
الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

তিনিই তাঁহার রসুলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।

(আত তওবা, আয়াত:৩৩))

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 7-8

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 15-22 ফেব্রুয়ারী, 2024 4-11 শাআবান 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

"তোমার আশিসসমূহের জ্যোতি পুনরায় প্রকাশ করার জন্য তোমার মাঝে থেকে এবং তোমারই বংশধরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে দাঁড় করানো হবে"

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আশিসমূহের প্রকাশ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

'খোদা আমাকে প্রতিশ্রুতি দান করে বলেছেন, 'তোমার আশিসসমূহের জ্যোতি পুনরায় প্রকাশ করার জন্য তোমার মাঝে থেকে এবং তোমারই বংশধরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে দাঁড় করানো হবে, যার মধ্যে আমি রুহুল কুদুস (পবিত্রাত্মা)-এর বরকত ফুৎকার করব। সে পবিত্রাত্মার অধিকারী হবে এবং খোদার সঙ্গে এক অতীব পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনকারী হবে। সে مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ- হবে, যেন আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। "

(তোহফায়ে গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃ: ১৮১)

"খোদা তা'লা আমাকে এক প্রত্যয়পূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর সংবাদ দান করে জানিয়েছেন যে, আমার বংশধরদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির জন্ম হবে যে কি না একাধিক বিষয়ে মসীহ্‌র সঙ্গে সাদৃশ্য রাখবে। সে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে আর জগতবাসীর জন্য পথ সরল করবে আর সে বন্দীদের মুক্তি দিবে এবং যারা সংশয়ের শেকলে আবদ্ধ তাদের মুক্তি দিবে। সম্মানিত মহৎ, প্রিয়-পুত্র مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ- كَاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮০)

"আমি তোমার জামা'তের জন্য তোমারই বংশধর থেকে এক ব্যক্তিকে দন্ডায়মান করব এবং তাঁকে আমার নৈকট্য ও ঐশী বাণীর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করবো। তাঁর দ্বারা সত্যের উন্নতি হবে এবং বহু লোক সত্যকে গ্রহণ করবে।

অতএব, সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা কর। তোমরা স্মরণ রাখবে যে প্রত্যেকের পরিচয় তার জন্য নির্ধারিত সময়ে পাওয়া যায় এবং তৎপূর্বে তাকে একজন সাধারণ ব্যক্তি বলে মনে হতে পারে অথবা কোন ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ তাকে সমালোচনার যোগ্য বলে প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর। যেমন এক সময়ে যিনি একজন কামেল পুরুষ হবেন, নির্দিষ্ট কাল পূর্বে তিনিও মাতৃগর্ভে 'নুৎফা' (বীর্য) অথবা ঘনীভূত রক্তস্বরূপই অবস্থান করেন।"

(আলওসিয়ত পুস্তিকা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৬, টীকা)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মুসলেহ মওউদ সংখ্যা

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)- এর সুমহান মর্যাদা

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আযিমুশশান ও মহান সুসংবাদ অনুসারে ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী, যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ঘরে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (রা.) এর জন্ম হয়। তাঁর খিলাফত সম্পর্কে বহু শতাব্দী পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। আঁ হযরত (সা.) স্বয়ং তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মসীহ মওউদ এর ঘরে বিশেষ গুণ ও মর্যাদা সম্পন্ন পুত্র সন্তানের জন্ম হবে। তাঁর সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)এর যুগের পূর্বে এবং পরের বুজুর্গদের ভবিষ্যদ্বাণীও পাওয়া যায়। সকল ভবিষ্যদ্বাণী যখন একদৃষ্টিতে দেখা হয় তখন জানা যায় যে, মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুত্র নিঃসন্দেহে এক বিশেষ গুণ ও মর্যাদার অধিকারী হবে। কিন্তু এর সঠিক অনুমান এবং বিবরণ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণী থেকে যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জানিয়েছিলেন। যে ভবিষ্যদ্বাণীটি মুসলেহ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী নামে জামাতের মধ্যে পরিচিত। মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে পঞ্চাশেরও বেশি গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একটি কথা যা মন ও মস্তিষ্ককে প্রভাব ফেলে সেটা আল্লাহ্‌র বাণী-

"كَأَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ" অর্থাৎ তাঁর আগমণ যেন আকাশ থেকে আল্লাহ্ অবতীর্ণ হয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার অসাধারণ সাহায্য ও সমর্থনের দিকে ইঙ্গিত ছিল। এখানে একটু ভেবে দেখলে অনুধাবন করা যায় যে, যে- ব্যক্তির আগমণকে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং নিজের আগমণ হিসেবে আখ্যায়িত করেন, সেই ব্যক্তি কিরূপ অসাধারণ গৌরব ও মর্যাদাসম্পন্ন হবেন! নিঃসন্দেহে তাঁর সত্তা কোন সাধারণ সত্তা ছিল না বরং, তিনি আদম সন্তানদের মাঝে সেই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁরা মানবতার আকাশে শত শত বছর নয় বরং হাজার হাজার বছরে একবার উদিত হন, যাঁদের জ্যোতি কোন প্রজন্ম বিশেষ নয়, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্মকে জ্যোতির্মণ্ডিত করে থাকে।"

মহাসম্মানিত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁকে "كَأَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ" উপাধি দানে প্রশংসা এতই শক্তিশালী যার থেকে অধিক সম্ভব নয়। এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সেই উপাধি যা থেকে তাঁর মহান মর্যাদা উপলব্ধি করা যায়। তিনি বাহান্ন বছর পর্যন্ত খিলাফতের অধিষ্ঠানে সমাসীন ছিলেন। এই সময়ে তিনি ইসলাম আহমদীয়াতের এমন অসাধারণ সেবা করেছেন, এমন এমন কীর্তিমান স্থাপন করেছেন যা একজন নবীর বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। যদিও আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নবী নামে অভিহিত করেন নি, কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ড নবী তুল্য। তিনি (রা.) বলেন, আমি প্রত্যাদিষ্ট নই, কিন্তু আমার মধ্যে খোদা তা'লা কথা বলেন আর খিলাফত ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের মধ্যবর্তী আমার মর্যাদা। ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত শূরা-য় তিনি বলেন-

" এক প্রকার খিলাফত হল খোদা তা'লা মানুষের দ্বারা খলীফা নির্বাচিত করার পর তিনি তাকে গ্রহণ করে নেন। কিন্তু এটা তদরূপ খিলাফত নয়। অর্থাৎ আমি এজন্য খলীফা নয় যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল এর মৃত্যুর দ্বিতীয় দিন জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা একত্রিত হয়ে আমার খিলাফতের উপর ঐক্যমত পোষণ করেছে, বরং আমি এজন্য খলীফা যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল এর খিলাফতেরও পূর্বে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খোদার তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে বলেছিলেন যে, আমি খলীফা হব। সুতরাং আমি (সাধারণ-অনুবাদক) খলীফা নই,বরং আমি প্রতিশ্রুত খলীফা। আমি প্রত্যাদিষ্ট নই। কিন্তু আমার কথা খোদার কথা, কেননা, খোদা তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এর সংবাদ দান করেছিলেন। অর্থাৎ এই খিলাফত 'মামুরিয়াত' (প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত পুরুষ) ও খিলাফতের মধ্যবর্তী মর্যাদা রাখে আর এটা সেই সুযোগ নয় যে জামাত আহমদীয়া এটিকে বিফল হতে দিয়ে খোদা তা'লার দরবারে সফল হতে পারে। যেভাবে একথা সঠিক যে প্রতিদিনই নবীর আবির্ভাব হয় না, অনুরূপভঅবে একথাও সঠিক যে প্রতিশ্রুত খলীফাও প্রতিদিন আসেন না।"

(সোয়ানেহ ফজলে উমর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫০৮)

নিম্নে আমি আরও কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি যা থেকে সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর সুমহান মর্যাদা, পদ, অসাধারণ কর্মকাণ্ড, তাঁর পাণ্ডিত্য এবং খোদা তা'লার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে জানা যায়। আর যা থেকে জানা যাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যেরূপ জারিউল্লাহ্ ফি হুলালিল আম্বিয়া ছিলেন, তদ্রূপ তাঁর পুত্রও ইসলামের এক অনন্য সাধারণ যোদ্ধা ছিলেন যার সামনে কেউ মুখ খোলার সাহস পেত না। তিনি (রা.) বলেন-

"হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর পর আমি সমগ্র বিশ্বকে আহ্বান করছি, যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের ধর্মের সত্য হওয়ার বিষয়ে বিশ্বাসী থেকে থাকে তবে সে আসুক, আমার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করুক। আমার নিকট অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রমাণ হয়েছে যে, ইসলামই জীবিত ধর্ম আর কোন ধর্ম এর মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারে না। কেননা খোদা তা'লা আমার দোয়া শোনেন এবং কবুল করেন, আর এমনভাবে কবুল করেন যে, যখন কি না বাহ্যিক উপকরণসমূহ সম্পূর্ণ প্রতিকূল থাকে। আর এটা ইসলামের জীবিত হওয়ার অনেক বড় নিদর্শন। যদি কারো সন্দেহ থাকে তবে এসে পরীক্ষা করে দেখুক। .... যারা নিজেদের ধর্মকে জীবিত ধর্ম হিসেবে বিশ্বাস করে, তারা এসে খোদা তা'লার সঙ্গে ভালবাসা ও সম্পর্কের প্রমাণ দিয়ে যাক। খোদা যদি তাদেরকে ভালবাসেন তবে তিনি নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করবেন। আমি তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন যাতে প্রমাণ হয় যে খোদা তা'লা কাকে সাহায্য করেন এবং কার দোয়া শোনেন। আপনাদের উচিত এই মোকাবিলার জন্য নিজেদের পক্ষ থেকে লোকদের দাঁড় করানো কিন্তু এর জন্য প্রত্যেকেই যেন মোকাবিলার জন্য না দাঁড়িয়ে পড়ে। বরং সেই সব লোকদের মোকাবিলায় দাঁড়ানো উচিত যারা কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। তখন জগত জানতে পারবে যে, খোদা কার দোয়া কবুল করেন। আমি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দাবি করছি, আমার দোয়াই কবুল হবে। পরিতাপ! বিভিন্ন ধর্মের প্রমুখ নেতারা এই মোকাবিলায় আসতে ভয় পায়। যদি তারা মোকাবিলার জন্য বের হয় তবে তাদের কপালে এমন পরাজয় জুটবে যে আর কখনও মোকাবিলা করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না।"

(জীবিত ধর্ম, আনোয়ারুল উলুম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬১২)

তিনি আরও বলেন:

"পৃথিবীর এমন কোন জ্ঞানের শাখা নেই যার মূলসূত্র ও নীতির বিষয়ে আমার বোধগম্যতা নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেই সব শাখার বই-পুস্তক আমি পড়ি নি অথচ খোদা তা'লা আমাকে সেই সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন। আর যেহেতু আমি কুরআনের আলোকে সেই সব জ্ঞানকে দেখি, সেই কারণে সব সময় আমি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হই আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এক বারের জন্যও আমাকে নিজের মতামত পরিবর্তন করতে হয় নি।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৩, পৃ: ৫০২)

তিনি বলেন,

"যে মহিমা, প্রতাপ ও পরাক্রম সহকারে খোদা তা'লার সর্বজ্ঞ হওয়ার গুণটির আমার মাধ্যমে জোতির্বিকাশ ঘটেছে তার দৃষ্টান্ত আমি খুলীফাকুলে আর কোথাও দেখি না। আমি সেই ব্যক্তি ছিলাম

এরপর ১১ পাতায়....

সূচিপত্র

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী	১
সম্পাদকীয়	২
হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত খুতবা জুমা	৩
হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর নাম ফজলে উমর কেন রাখা হয়েছে?	৯
হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর মর্যাদা	১৩
তদন্ত আদালতে মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর বিবৃতি	১৪
কবরে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার বিষয়ে মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশ ও এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা	১৮

*****❖*****❖*****❖*****

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার সমীপে কুরবানীর মানদণ্ড হলো (ত্যাগের) প্রেরণা ও অনুপাতের, (কুরবানীর) অংকের নয়

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এ বছর এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার (১২৯৪১০০০) পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করেছে। অর্থাৎ প্রায় তেরো মিলিয়ন পাউন্ড। এই আদায় পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে সাত লক্ষ আঠারো হাজার পাউন্ড বেশি।

এখন আর সশস্ত্র জিহাদের যুগ নেই। কিন্তু ইসলামী শিক্ষাকে বিস্তৃত করার জন্য কলমের জিহাদ এবং তবলীগের জিহাদ অব্যাহত আছে। আর এই জিহাদকে অব্যহত রাখার জন্যও প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মানের কুরবানীর সেভাবেই প্রয়োজন রয়েছে যেভাবে ইসলামের প্রথমযুগে কুরবানীর প্রয়োজন ছিল।

এখন আর সশস্ত্র জিহাদের যুগ নেই। কিন্তু ইসলামী শিক্ষাকে বিস্তৃত করার জন্য কলমের জিহাদ এবং তবলীগের জিহাদ অব্যাহত আছে। আর এই জিহাদকে অব্যহত রাখার জন্যও প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মানের কুরবানীর সেভাবেই প্রয়োজন রয়েছে যেভাবে ইসলামের প্রথমযুগে কুরবানীর প্রয়োজন ছিল।

বর্তমান যুগে এই আর্থিক জিহাদ-ই আত্মিক জিহাদেরও মাধ্যম হয়ে থাকে। মানুষ নিজেদের অনেক কামনা-বাসনাকে পেছনে ঠেলে ধর্মের উন্নতির জন্য যে ত্যাগস্বীকার করে থাকে এটি আসলে তাদের আত্মিক কুরবানী হয়ে থাকে, যা আল্লাহ তা'লার কৃপাবারি আকর্ষণ করে তাকে এবং তার বংশধরদের অসংখ্য আশিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বর্তমান যুগে কেবল আহমদীরা-ই ধর্মের খাতিরে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব অনুধাবন করে। তারা শিশির বিন্দুর মতো অল্প অল্প অর্থ (আল্লাহ্র রাস্তায়) দিলেও আল্লাহ্ তা'লা সেগুলোকে অঢেল ফলবাহী করেন।

তারা যারা সেসব প্রবীণ এবং সাহাবীদের সন্তান (তারা) সর্বদা এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখুন যে, আজ তাদের প্রতি যদি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা হয়ে থাকে তাহলে তা ঐসব মানুষের কুরবানীর কারণে।

কোনো দুর্বল আহমদীর হৃদয়েও কখনো এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা পুণ্য নিয়্যতের সাথে কৃত কুরবানীর জন্য পুরস্কৃত করেন না। আল্লাহ্ তা'লার ধনভাণ্ডার অসীম। আমাদের গুটিকতক পয়সার তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। এসব কুরবানী যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছ থেকে চান, এর মাধ্যমে তো তিনি আমাদেরকে সমধিক কৃপাভাজন করার সুযোগ প্রদান করেন।

অর্ধেক খেজুর খরচ করার সামর্থ্য থাকলে (তা ব্যয়) করে আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। (সহীহ বুখারী,

ওয়াকফে জাদীদের ৬৬তম বছরের আর্থিক কুরবানী সমূহের ঈমান-উদ্দীপক বর্ণনা সমূহ এবং নতুন বছরের ঘোষণা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৫ই জানুয়ারী,, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (৫ সুলাহ, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝١٠ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝١١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٢ (الصّف آیات 11 تا 13)

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, হে, যারা ঈমান এনেছো! আমি কি তোমাদের এমন এক বানিজ্যের সংবাদ দিবো যা তোমাদের এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তোমরা যারা আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করো আর আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধনসম্পদ এবং প্রাণের মাধ্যমে জিহাদ করো, এটি তোমাদের জন্য অনেক উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞান রাখো। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন আর তোমাদের এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যেগুলোর পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। আর এমনসব পবিত্র ঘরেও (প্রবেশ করাবেন) যেগুলো চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে রয়েছে। এটি অনেক বড় সফলতা। (সূরা সাফ্ফ: ১১-১৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি এক জায়গায় বলেছেন যে, আমিও মূসায়ী মসীহ্র পদাঙ্কে প্রেরিত হয়েছি। আর যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) দয়া ও ক্ষমার শিক্ষা প্রদান করেছিলেন আমিও দয়া ও ক্ষমা এবং সন্ধি ও মৈত্রির ইসলামী শিক্ষা সহ মুহাম্মদী মসীহ্ হিসেবে প্রেরিত হয়েছি আর ধর্মীয় যুদ্ধের অবসানের জন্য এসেছি। আর এই যুগ এখন পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রচারের যুগ। (আরবাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৩৪৪)

এখন আর সশস্ত্র জিহাদের যুগ নেই। কিন্তু ইসলামী শিক্ষাকে বিস্তৃত করার জন্য কলমের জিহাদ এবং তবলীগের জিহাদ অব্যাহত আছে। আর এই জিহাদকে অব্যহত রাখার জন্যও প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মানের কুরবানীর সেভাবেই প্রয়োজন রয়েছে যেভাবে ইসলামের প্রথমযুগে কুরবানীর প্রয়োজন ছিল।

এই যুগ যখন কিনা অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য পৃথিবীতে পূর্ণ চেষ্টা চলছে। ধর্মকে তো মানুষ ভুলেই গেছে, জগতের প্রতি আকর্ষণ বেশি। ব্যবসা বাণিজ্যে প্রাধান্য লাভ আর জাগতিক স্ব াচ্ছন্দ্য লাভের প্রতি জগদ্বাসী নিজেদের পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করছে। এমতাবস্থায় ধর্মের প্রচারের জন্য কুরবানীই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং সফল ব্যবসা, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা একথাই বর্ণনা করেছেন যেগুলো আমি তিলাওয়াত করেছি। অতএব এই যুগ যা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ, এ যুগে বিশেষত আর্থিক জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর এরপর এর মাধ্যমে আত্মত্যাগেরও প্রেরণা জাগে। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং নৈকট্যও লাভ হয়।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে আর্থিক কুরবানীর প্রতি বহু স্থানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এক স্থানে তিনি বলেন, ***'ওয়ামা লাকুম আল্লা তুনফিকু ফি সাবিলিল্লাহ'*** (সূরা হাদীদ: ১১)। অর্থাৎ তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করো না। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সবকিছুই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আসে। তিনিই তোমাদের দান করেন।

পুরস্কৃত করার জন্য তিনি তোমাদের বলেন যে, তাঁর পথে ব্যয় করো। অতএব যদি ঈমান থেকে থাকে, যদি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস থাকে, তাহলে এর দাবি হলো তাঁর পথে তোমরা কুরবানী করো।

অতঃপর এক স্থানে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে (আল্লাহ্ তা'লা) বলেন, وَاَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ (সূরা বাকারা: ১৯৬)। অর্থাৎ আর আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ করো আর নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। অতএব আল্লাহ্ তা'লার পথে তাঁর দেওয়া সম্পদ থেকে যারা খরচ করে না তারা নিজেদেরকে ধ্বংসে মুখে ঠেলে দেয়। বর্তমান যুগে এই আর্থিক জিহাদ-ই আত্মিক জিহাদেরও মাধ্যম হয়ে থাকে। মানুষ নিজেদের অনেক কামনা-বাসনাকে পেছনে ঠেলে ধর্মের উন্নতির জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করে থাকে এটি আসলে তাদের আত্মিক কুরবানী হয়ে থাকে, যা আল্লাহ তা'লার কৃপাবারি আকর্ষণ করে তাকে এবং তার বংশধরদের অসংখ্য আশিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা কারো ঋণ রাখেন না। আল্লাহ্ তা'লা এমন এক ব্যবসার সংবাদ দিয়েছেন যা ইহ ও পরকালের কল্যাণে পর্যবসিত হয় এবং তা আযাব হতে রক্ষাকারী ব্যবসা। জাগতিক ব্যবসা বানিজ্য তো কেবল জাগতিক লাভের জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত ব্যবসা, ইহকাল ও পরকাল, উভয় জগতের পুরস্কারের যোগ্য করে তুলে। আমি যেমনটি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা কারো ঋণ রাখেন না। পবিত্র মনমানসিকতা নিয়ে তাঁর পথে কৃত কুরবানীর প্রতিদান তিনি কয়েক গুণ বাড়িয়ে ফেরত দেন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এক স্থানে বলেন,

وَمَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِیْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَیْنِ فَاِنْ لَّمْ یُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ

(সূরা বাকারা: ২৬৬) অর্থাৎ আর যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সন্ধানে এবং নিজেদের মধ্য থেকে কতককে দৃঢ়তা প্রদানের জন্য খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায় যার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলে পরে তা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টিপাত না-ও হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট। আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বর্তমান যুগে কেবল আহমদীরা-ই ধর্মের খাতিরে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব অনুধাবন করে। তারা শিশির বিন্দুর মতো অল্প অল্প অর্থ (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) দিলেও আল্লাহ্ তা'লা সেগুলোকে অঢেল ফলবাহী করেন।

জামা'তের উন্নতি এরই সাক্ষ্য দেয়। তারা দরিদ্র মানুষ, যারা সামান্য কুরবানী করে থাকে আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা সেগুলোর অঢেল ফল দান করেন। বিশেষত দরিদ্র আহমদী এবং স্বল্প আয়ের আহমদীরা অধিক কুরবানী করে থাকে। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমি মাঝে মাঝে সেগুলো বর্ণনাও করে থাকি। আজও বর্ণনা করব।

আর এসব উদাহরণের মাধ্যমে বিত্তবান আহমদীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত তাদের দেখা উচিত যে তাদের মান কেমন। এক দরিদ্র আহমদী যখন আর্থিক কুরবানী করে তখন সে নিজের প্রবৃত্তি ও প্রাণের বিরুদ্ধে জিহাদ করে ।

আফ্রিকায় অসংখ্য এরূপ কুরবানীর দৃষ্টান্ত রয়েছে, পাকিস্তানে রয়েছে, ভারতেও রয়েছে, যারা খাদ্য ক্রয় না করে, অনাহারে থেকে, আর্থিক কুরবানী করে থাকে। নিজ অথবা নিজের সন্তানের অসুস্থতায় ঔষধের জন্য অর্থ খরচ করার পরিবর্তে চাঁদা আদায় করাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাদের এ কুরবানীকে বিফল হতে দেন না, বরং অনেক সময় তারা এত দ্রুত আল্লাহ তা'লার আশিসের উত্তরাধীকারী হয়ে যায় যে, আশ্চর্য হতে হয়। আর এটি তাদের জন্য ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়।

সুতরাং কোনো দুর্বল আহমদীর হৃদয়েও কখনো এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা পুণ্য নিয়্যতের সাথে কৃত কুরবানীর জন্য পুরস্কৃত করেন না। আল্লাহ্ তা'লার ধনভাণ্ডার অসীম। আমাদের গুটিকতক পয়সার তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। এসব কুরবানী যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছ থেকে চান, এর মাধ্যমে তো তিনি আমাদেরকে সমধিক কৃপাভাজন করার সুযোগ প্রদান করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জামা'তে কুরবানীর এমন প্রেরণা সঞ্চার করেছেন যে তাঁর যুগ হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা জামাতে এমন দৃষ্টান্ত দেখতে পাই । অর্থাৎ জামা'তের সদস্যরা নিজেদের সমস্ত প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে জামা'তের প্রয়োজনে ত্যাগ স্বীকার করে থাকে। এটিই প্রগতিশীল জাতির কর্মপন্থা। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কৃপাধন্য করেন। এই মান্যকারীরা সে বিষয়ের জ্ঞান বা বুৎপত্তি রাখেন যা মহানবী (সা.) বলেছেন। অর্থাৎ, অর্ধেক খেজুর খরচ করার সামর্থ্য থাকলে (তা ব্যয়) করে আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। (সহীহ বুখারী, কিতাবু যাকাত, হাদীস-১৪১৭)

এরপর তিনি (সা.) বলেন, কার্পণ্য বর্জন কর; এই কার্পণ্যই পূর্ববতী জাতিগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছিল।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবু যাকাত, হাদীস-১৬৯৮)

সাহাবীদের দৃষ্টান্ত দেখুন, (তারা) বলেন, মহানবী (সা.) যখনই কোনো আর্থিক তাহরীক করতেন আমরা বাজারে যেতাম, কায়িক শ্রম দিয়ে যৎসামান্য যে পারিশ্রমিক আসতো সেই উপার্জন এনে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করতেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-১৪১৬)

এমন কুরবানীকারীই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিষ্ঠাবান দাসকেও দান করেছেন। এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। ইতিহাসে এমন ভাইদের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা এমন এমন কুরবানী করেছেন যে, বিস্মিত হতে হয় আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও তাদের উল্লেখ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, "আমি আমার জামা'তের (সদস্যদের) ভালোবাসা ও নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হই যে, তাদের মধ্য হতে একেবারেই স্বল্প উপার্জনশীল যেমন, মিয়াঁ জামাল উদ্দীন, খায়ের উদ্দীন এবং ইমাম উদ্দীন কাশ্মীরী আমার গ্রামের নিকটেই থাকে। সেই তিনজন দরিদ্র ভাই, যারা সম্ভবত কায়িক শ্রমের বিনিময়ে দৈনিক তিন আনা বা চার আনা উপার্জন করে কিন্তু আন্তরিক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে মাসিক চাঁদা আদায় করেন। তাদের বন্ধু মিয়াঁ আব্দুল আযীয পাটওয়ারীর নিষ্ঠা দেখেও আশ্চর্জ হতে হয়। জীবিকার অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও একদিন একশ' রূপি দিয়ে যান (আর বলেন,) আমি চাই (এই অর্থ) খোদার পথে ব্যয় হোক। সেই সহায় সম্বলহীন (ব্যক্তি) হয়ত কয়েক বছরে এই একশ' রূপি সঞ্চয় করে থাকবেন কিন্তু ধর্মীয় উচ্ছাস ও উদ্দীপনা(তার মাঝে) খোদার সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণা সঞ্চার করেছে।"

(আঞ্জামে আথাম পুস্তিকার পরিশিষ্টাংশ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১১, পৃ: ৩১৩-৩১৪)

কাজেই, জামা'তের ইতিহাসে এসব কুরবানীকারীর নাম সংরক্ষিত আছে। এসব মানুষ, যারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রকার বিশেষ উদ্দীপনা রাখতেন। তারা সামান্য কুরবানী করুন কিংবা বেশি, তাদের নাম মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর মিশনের সাহায্যকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; (আর) ইতিহাস তা সংরক্ষণ করেছে। (এ খানে) আরেকজন পুণ্যবান ব্যক্তির কথা উল্লেখ করছি। তিনি একজন প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র (মানুষ) ছিলেন। তার নাম ছিল হাফেয মঈন উদ্দীন সাহেব। তার মধ্যে জামা'তের সেবা ও জামাতের জন্য কোরবানী করার গভীর উদ্দীপনা ছিল। অথচ খুবই অসচ্ছলতার মাঝে দিনাতিপাত করতেন। প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে কোনো কাজও ছিল না। মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুরোনো সেবক জ্ঞান করে (তাকে) কিছু উপহার দিয়ে দিত। কিন্তু হাফেয সাহেবের রীতি ছিল, তিনি উপহার হিসেবে প্রাপ্ত এমন অর্থ কখনও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করতেন না; বরং তা জামা'তের সেবার মানসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে তুলে দিতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে কখনও এমন কোনো (চাঁদার) তাহরীক হয়নি যাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি। এক পয়সা দিয়ে হলেও অবশ্যই অংশ নিতেন। এক পয়সা বলতে সে যুগের এক পেনির সমান মনে করতে পারেন। তার (আর্থিক) অবস্থা অনুযায়ী এই সামান্য কুরবানীও অসাধারণ কুরবানী ছিল। অনেক সময় হাফেয সাহেব উপোস থেকেও এই সেবা করতেন। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড-১৩, পৃ: ২৯৩)

এরা এমন মানুষ ছিলেন যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সবকিছু ত্যাগ করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন। তাদের কুরবানীও আল্লাহ্ তা'লা স্নেহের সাথে মূল্যায়ন করেছেন এবং সেই ফল দিয়েছেন যা আজ তাদের বংশধররাও ভোগ করছে। অতএব, তারা যারা সেসব প্রবীণ এবং সাহাবীদের সন্তান (তারা) সর্বদা এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখুন যে, আজ তাদের প্রতি যদি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা হয়ে থাকে তাহলে তা ঐসব মানুষের কুরবানীর কারণে।

যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, জামা'তের সেবার জন্য এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তাদের ত্যাগের মান এই চেতনা অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে কী যা তাদের গুরুজনদের ছিল। আজও আহমদীয়া জামা'তের সিংহভাগ সদস্য দরিদ্র, যারা ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কাজেই, জামা'তের সদস্যদের মধ্যে যারা অধিক উপার্জনশীল তাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) নিষ্ঠার সাথে কৃত কুরবানীর মূল্যায়ন করেন। যেমনটি একবার মহানবী (সা.) বলেন, (আজ) এক দিরহাম একলাখ দিরহামের বিপরীতে এগিয়ে গিয়েছে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, (তা) কীভাবে? মহানবী (সা.) বলেন, একজনের কাছে দুই দিরহাম ছিল। সে (তা থেকে) এক দিরহাম কুরবানী করেন। আর অন্য ব্যক্তির কাছে অঢেল অর্থ -কড়ি ও সম্পদ ছিল। সে তা থেকে এক লাখ দিরহাম কুরবানী করে।

(সুনান আন নিসাঈ, কিতাবুয যাকাত)

বাহ্যত এই লাখ দিরহাম অনেক বড়ো অংক। কিন্তু সেই দরিদ্র ব্যক্তির কুরবানীর আন্তরিকতার তুলনায় সে-ই এক লাখ দিরহামের আল্লাহ্‌র নিকট তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার সমীপে কুরবানীর মানদণ্ড হলো (ত্যাগের) প্রেরণা ও অনুপাতের, (কুরবানীর) অংকের নয়। যারা বলে, জামা'ত দরিদ্রদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়, তা ঠিক নয়, (কতেক এমন মানুষও আছে যারা কখনও কখনও আমাকে এমন কথা লিখে পাঠিয়ে দেয়।) এসব মানুষ মূলত সংকীর্ণমনা। তাদের নিজেদের বিভিন্ন জাগতিক চাওয়পাওয়া রয়েছে আর নিজেদের কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য অন্যদের নাম নেয়।

আল্লাহ্‌র কৃপায় জামা'তের অধিকাংশ সদস্য এমন যারাকুরবানী করে থাকে। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের বিভিন্ন ত্যাগ ও কুরবানীকে দৃষ্টিপটে রেখে নিজেরাও কুরবানী করতে চায় এবং না বলা সত্ত্বেও করে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের নিষ্ঠাবানদের কুরবানীর অনুকরণে কৃতএমনসব দৃষ্টান্ত আজও আমরা দেখতে পাই। যেমনটি আমি বলেছি, বিভিন্ন রিপোর্টে উল্লেখ থাকে আর আমিও উল্লেখ করে থাকি। বিস্ময়করভাবে কুরবানী করে থাকে। সুদূর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী নিষ্ঠাবানরাও পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার ও ধর্মের বিজয়ের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী ও সহযোগী হতে চায়। এসব মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বক্তব্যকে দৃষ্টিপটে রেখে কুরবানী করে থাকে। যাতে তিনি (আ.) বলেছেন,"তোমাদের জন্য সম্ভব নয় যে একই সাথে আল্লাহ্‌কেও ভালবাসতে আবার সম্পদের প্রতিও ভালোবাসা রাখবে । কেবল একটির প্রতি ভালোবাসা রাখা সম্ভব। অতএব, সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে। তোমাদের কেউ যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবেসে তাঁর পথে আর্থিক কুরবানী করে তাহলে আমি বিশ্বাস রাখি যে, তার সম্পদে অন্যদের তুলনায় বেশি কল্যাণ প্রদান করা হবে। কেননা, ধন-সম্পদ আপনা-আপনি আসে হয় না বরং মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আসে। অতএব, যে ব্যক্তি খোদার জন্য সম্পদের কিছু অংশ ত্যাগ করে নিশ্চিতরূপে সে তা (ফিরে) পাবে।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৭)

এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্য। আজও আমরা এর দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করি যে, কীভাবে মানুষ খোদার পথে দিয়েছে আর কীরূপে তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তাদেরকে তা ফিরিয়ে দিয়েছেন(অর্থাৎ পুরস্কৃত করেছেন)। একই জায়গায় (এবং) একই পরিবেশে কাজ করে কিন্তু আহমদীদের সম্পদে আল্লাহ্ তা'লা বরকত দান করেন কিন্তু অন্যরা সেই কল্যাণ লাভ করে না। এসব বিষয় তাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। যেমনটি আমি বলেছিলাম, নিষ্ঠাবানদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

রিপাবলিক অব সেন্ট্রাল আফ্রিকায় কুতুম্বালা নামে একটি জায়গা রয়েছে। সেখানে ঈসা সাহেব নামী একজন নবাগত আহমদী আছেন। তিনি বলেন, আমি নয় মাস পূর্বে বয়আত করেছিলাম। আর ২০১৬ সাল থেকে আমার কাছে একটি প্লট ছিল যা আমি বাড়ি বানানোর জন্য ক্রয় করেছিলাম কিন্তু বাড়ি নির্মাণের জন্য টাকা সঞ্চয় করা সম্ভব হচ্ছিল না । জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে চাঁদার গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে শুনতে থাকি। খোদার রাস্তায় যা-ই কমবেশি কুরবানী করতে পারতাম করতাম। শুনতাম যে, আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে জীবন সহজ করে দেন এবং ধন ও জনসম্পদের ক্ষেত্রে উন্নতি দান করেন। যাহোক, তিনি বলেন, আমার হৃদয়ে ভাবনার উদয় হলো যে আমরা যখন অআহমদী ছিলাম তখন আমরা কেউই খোদার রাস্তায় কোনো চাঁদা আদায় করি নি এবং কেউ আমাদেরকে এ বিষয়ে বলেও নি। বর্তমানে চাঁদার আহ্বান জানানো হয়েছে। সাধারণত নও-মুবাঈনদেরকে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বিষয়ে বলা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়। আমি ওয়াকফে জাদীদ খাতে পনেরোশো সীফা আদায় করি আর খোদা তা'লা এর প্রতিদান এভাবে প্রদান করেন যে, এক বন্ধু বাড়ি বানানোর জন্য দশ হাজার ইট বানানোর প্রস্তাব দেয় আর ইট বানিয়ে দেয়। সেখানে সিমেন্ট দিয়ে নিজেরাই ব্লক বানিয়ে থাকে। এভাবে বাড়ি নির্মাণ আরম্ভ হয়ে যায় যার জন্য কয়েক বছর ধরে অপেক্ষা ছিল। বাড়ির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। অতঃপর এটি বলেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই হয়েছে কেননা আমার কোন সামর্থ্য ছিল না এবং আমার জন্য অসম্ভব ছিল।

কাযাখিস্তান সাবেক রাশিয়ান দেশগুলোর একটি স্টেট। সেখানকার এক বন্ধু দাওরীন সাহেব বলেন, কিছুদিন পূর্বে আমি মুয়াল্লিম সাহেবের বার্তা পাই যে, এ বছর আপনার স্ত্রীর ওয়াকফে জাদীদ খাতের চাঁদা অনেক কম এবং তালিকার শেষে অবস্থান। যদি সম্ভব হয় কমপক্ষে পাঁচ হাজার তাঙ্গে আদায় করুন। আমি ভাবি, বর্তমানে আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, তার অপারেশনও করাতে হবে, তাই পনেরো হাজার তাঙ্গে আদায় করলে ভালো হবে। আমি অর্থ প্রেরণ করার প্রায় বিশ মিনিট পরই স্কুল থেকে সংবাদ আসে, যে যেহেতু আপনি একজন এতিম লালনপালন করেন এবং সন্তানাদিও বেশি তাই সরকার আপনাকে এক লাখ তাঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এভাবে এটি আমার ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে (বর্ধিত আকারে) ফেরত দিয়েছেন।

কিরগিস্তান আরেকটি রাষ্ট্র। সেখানকার এক বন্ধু হুরমত সাহেব, স্বর্ণের খনিতে কাজ করেন। ছয় মাস পর পর চাঁদা আদায় করতেন। বিগত বছর যখন দ্বিতীয় ষান্মাসিক চাঁদা আদায় করেন তখন স্থানীয় মুদ্রায় হারের চেয়ে ছয় হাজার সুম বেশি আদায় করেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যেহেতু সারা পৃথিবীতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সেকারণে জামা'তের খরচও বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে, তাই আমি ওয়াদার চেয়ে বাড়িয়ে নিজের চাঁদা আদায় করছি। এ বছরও তিনি যখন প্রথম ষান্মাসিক চাঁদা আদায় করেন তখন আরো ছয় হাজার সুম বেশি চাঁদা আদায় করেন। এভাবে তিনি প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি চাঁদা আদায় করেন। এই হলো আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি সন্ধানের দৃষ্টান্ত। কেউ তাকে আহ্বান জানায় নি কিন্তু প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে তিনি নিজেই বেশি দেওয়ার চেষ্টা করেন ।

মানুষ বলে থাকে, চাও কেন? আমরা চাই না বরং আমরা তো আল্লাহ্ তা'লার বাণী প্রচার করে থাকি যে, আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগস্বীকার করো।

আরেকটি দেশ হলো ফিলিপাইন, দূরদূরান্তের এলাকা। সেখানকার মুবাল্লিগ বলেন, খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর বর্ণনা করেন, আমি ওয়াদা অনুযায়ী ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করে দিয়েছিলাম।আর্থিক বছরের সমাপ্তি ঘটছিল আর হৃদয়ে বাসনা জাগলো যে, ওয়াদার চেয়ে বেশি আদায় করা উচিত। তাই আমি আমার মরহুম পিতা, মাতা ও শ্বশুরের নামেও এক হাজার পিরসো চাঁদা ওয়াকফে জাদীদ খাতে আদায় করি। সেদিনগুলোতে স্থানীয় পৌরসভা অফিসে রিস্করিডাকসান ম্যানেজার হিসেবে চুক্তিভিত্তিক কাজ করছিলাম। নববর্ষের ছুটি শেষে যখনই কাজে যোগদান করি স্থানীয় মেয়র আমার চাকুরি স্থায়ী করে দেন এবং আমার বেতনও দ্বিগুণ করে দেন অথচ আমি বিগত চার বছর ধরে চুক্তিভিত্তিক কাজ করছিলাম এবং বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও আমার চাকুরী স্থায়ী হচ্ছিল না। তিনি বলেন, এখন আমার বিশ্বাস হলো, আমি যে কুরাবানী করেছি, এটি তারই প্রতিফল এবং খোদা তা'লা সুনিশ্চিতভাবে আমাদের কল্পনাতীত ভাবে দানে ধন্য করেন।

আফ্রিকার একটি দেশের নাম ক্যামেরুন। সেখানকার এক মুরব্বী সাহেব বলেন এক যুবকের নাম ইউসুফ সাহেব। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। দরিদ্র ব্যক্তি এবং মোটর সাইকেলে যাত্রী বহন করেন। মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বলেন, যখন থেকে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি এবং মুরব্বী সাহেবের উপদেশে কমবেশি চাঁদা দেয়া শুরু করেছি, তখন থেকে আমার অবস্থা সচ্ছল হতে থাকে । এখন আমার হৃদয় বেশ প্রশান্ত আর আমার জীবনের সবকিছু সহজ হয়ে গেছে। [প্রকৃত বিষয় হলো আত্মার প্রশান্তি। তিনি বলেন] চাঁদা দেয়ার ফলে আমার হৃদয়ও প্রশান্ত হয়েছে। আমি এখন নিয়্যত করেছি, কেবল ওয়াকফে জাদীদ নয় বরং সকল আবশ্যকীয় চাঁদায় আমি অংশগ্রহণ করব কেননা এর মাঝে আমার জন্য এবং আমার পরিবারের জন্য বরকত রয়েছে। মূলতঃ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এরই কল্যা এটি যে আমি আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয়েছে, (এখন) আমি খুব আনন্দিত ও সন্তুষ্ট। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা সাহায্যকারী সৃষ্টি করেন।

পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ তানযানিয়া। রোমোমা রিজিয়নের এক যুবকের নাম মিলোয়ে সাহেব। তিনি বলেন, আমার বয়স সাতাশ বছর। আমি চাঁদা প্রদানের অনেক বরকত প্রত্যক্ষ করেছি। আমি কৃষিকাজ করি। এ বছর আমার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধের মানসে আমার ফসল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দ্রুত জমা করে দেই। আমার জমিতে যে ফসল উৎপাদিত হয়েছে তা আমি সরকারের কাছে বিক্রি করে দিই। আমি যদি আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতাম তাহলে সম্ভবত আমার ফসলের অধিক মূল্য পেতাম কিন্তু আমি চাঁদা প্রদান করতে পারতাম না। সময় চলে যেত। তিনি বলেন, যাহোক, আমি যখন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করি তখন সেই দিনগুলোতে কৃষকরা তাদের ফসলের যে মূল্য পাচ্ছিল, আমি তাদের চেয়ে বেশি মূল্য পাই যা দিয়ে আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করি। উক্ত প্রতিষ্ঠান বলে, মানুষ বেশি মূল্য আদায়ের লোভে নিজেদের ফসল ধরে রাখে । তুমি তোমার সততার পুরস্কার পেয়েছ। তিনি বলেন, আমি মনে করি, আল্লাহ্ তা'লা আমার নিয়্যতের প্রতিফল দিয়েছেন যেন আমি সহযে তাঁর পথে কুরবানী করতে পারি।

কিরগিস্তান থেকে রোযা মাউত সাহেব নামের এক বন্ধু ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বিষয়ে বলেন, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তাহরীক এবং এর সাথে আমার পরিচয় খুবই চিত্তাকর্ষক। আমার স্মরণ আছে, আমি যখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে পরিচিত হই তখন মোবাল্লেগ সাহেবকে জিজ্ঞেস করি যে, জামা'তের সকল ব্যয় কে নির্বাহ করে? তিনি আমাকে

জামা'তের কাজ, খেলাফত ব্যবস্থাপনা এছাড়া বিভিন্ন তাহরীক, ওয়াকফে জাদীদ এবং অন্যান্য আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত করেন । তখন তিনি বলেন, ইতোঃপূর্বে আমি এ ধরনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি কখনো দেখিও নি আর শুনিও নি। আমি প্রথমবার এমন কোনো ব্যবস্থাপনার কথা শুনলাম। আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যুগে বয়আত করার পর প্রত্যেক মাসে চাঁদা দেয়া শুরু করি এবং সারা জীবন চাঁদা প্রদানের অগণিত কল্যাণ দেখেছি। জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে আমি আমার পরিবারের সাথে ভাড়া বাসায় থাকতাম। আমরা খুব কষ্টকর জীবন কাটাচ্ছিলাম। বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছি। দৈন্যদশা ছিল। সহায়-সম্পদ আর স্থায়ী আয়-রোজগার কিছুই ছিল না। চাঁদার বরকতে এখন আমি একটি বড় বাড়ি নির্মাণ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমার স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা আছে, কাজও কঠিন নয় এবং বেতনও ভালো। চাঁদার বরকতে আল্লাহ্ আমার প্রতি এসব বিশেষ কৃপা করেছেন।

পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ টোগো, সেখানকার মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, একজন আহমদী মহিলার নিকট ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার জন্য অর্থ ছিল না। তাই তিনি তার পরিবারের ব্যবহারের জন্য চাষ করে রেখেছিলেন। সবজি বাজারে বিক্রি করে খোদার সাথে কৃত নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করেন এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করেন। অত্যন্ত সাধারণ জিনিস ছিল। সাহাবীরা যেভাবে বাজারে গিয়ে কাজ করতেন অথবা হাফেয সাহেব উপঢৌকন হিসেবে যা-ই পেতেন তা দিয়ে দিতেন- এটি সেধরণেরই একটি দৃষ্টান্ত ।

অনুরূপভাবে একজন সদস্য হামযা সাহেবের নিকট ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দেওয়ার জন্য অর্থ ছিল না। তার নিকট কিছু মুরগী ছিল তাথেকে ৯টি মুরগি বিক্রি করে চাঁদা আদায় করেন। এ সকল দরিদ্র ব্যক্তিরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কুরবানী করেন এবং এরাই সে সকল ব্যক্তি যারা পুরনো বুযূর্গদের স্মৃতি সতেজ করেন।

ইন্দোনেশিয়ার এক বন্ধু ঈমান হেদায়েত সাহেব বলেন, আমি জন্মগত আহমদী। প্রথমে আমি একজন সাধারণ সদস্যের ন্যায় চাঁদা আদায় করতাম। একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল যে, একজন আহমদী হিসেবে চাঁদা দিতে হবে। তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের কুরবানীর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতাম না। এতে আমার সকল ভাইয়েরা উভয় তাহরীকের বরাতে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, কেবল আহমদী হবার দরুন চাঁদা প্রদান করি না বরং আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আর্থিক কুরবানী করে থাকি। তিনি বলেন, এর ফলে আমার মধ্যে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদে আংশগ্রহণের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং আমি উভয় তাহরীকে আর্থিক কুরবানী করতে শুরু করি। আর এতে অংশগ্রহণের পর আমি আমার জীবনে অনেক বড় পরিবর্তন অনুভব করি। আমি নিজেকে আল্লাহ্ তা'লার অনেক নিকটে অনুভব করি। আমার ওপর জামাতী দায়িত্বাবলিও ন্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে রিযক-এর ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ভালোবাসার বহিপ্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো এমর্মে আল্লাহ্ তা'লার বাণী চাদার কল্যাণে পূর্ণ হতে দেখেচি যে যদি তুমি হেঁটে আমার নিকট আস তবে আমি তোমার নিকট দৌড়ে আসব।

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরের এক বন্ধু নিজের ঘটনা লিখে পাঠান যে, ওয়াকফে জাদীদের আর্থিক বছর শেষ হবার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আহ্বান জানানো হয় যে, যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল তারা যেন ওয়াকফে জাদীদ খাতে ন্যূনতম ৫ হাজার ডলার আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি ওয়াকফে জাদীদ খাতে ৪ হাজার ডলার আদায় করেছিলাম। আমার নিকট ৫ হাজার ডলার ছিল না। কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, ওয়াকফে জাদীদ খাতে আমার ৫ হাজার ডলার আদায় করা উচিত। অতএব জুমুআ থেকে ফেরার পথে আমি দোয়া করতে শুরু করি। ভালো অবস্থায় ছিলেন , হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয় ছিল, একটি একাগ্রতা ছিল, আকাঙ্খা ছিল, যার ফলে তার দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। তিনি বলেন, আমি দোয়া করি। আমি ছোটোখাটো ব্যাবসা করি। একদিন আমি সংক্ষিপ্ত বিরতির জন্য অফিস থেকে কিছু সময়ের জন্য বাইরে বের হই এবং এই মর্মে দোয়াও করতে থাকি যে আল্লাহ আমাকে এই খাতে চাদা দেয়ার তৌফিক দাও। তিনি বলেন, যখন আমি অফিসে ফেরত আসি তখন আমার খ্রিষ্টান ব্যাবসায়িক পার্টনারও আমার অফিসে আসে এবং দরজা বন্ধ করে দেয় এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে করমর্দন করে বলে যে, একটি বড়ো সুসংবাদ আছে। বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলে যে, এক বড় সংবাদ আছে। একটি বড় কাজের জন্য একজন গ্রাহক সেটআপের জন্য আবেদন করেছে এবং এর ফিস ত্রিশ হাজার, যার মধ্যে পনেরো হাজার করে আমাদের উভয়ের ভাগে আসবে। তিনি বলেন, আমার বুঝতে দেরি হয় নি যে, আমার দোয়া কবুল হয়ে গেছে। আমি আমার ব্যবসায়িক পার্টনারকে বলি যে, আমি কী দোয়া করছিলাম এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাহায্য করেছেন আর আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়ার উত্তর প্রদান করেছেন। এতে সেই ব্যবসায়িক পার্টনারও বলে যে, চাঁদা হিসেবে ৫ হাজার ডলার অনেক বেশি। তিনি বলেন, তোমার দোয়ায় আমারও উপকার হয়েছে তাই উক্ত অনুদানে আমারও অংশ থাকবে। তোমাকে যে পরিমাণ অর্থ দিতে হবে তার অর্ধেক আমি দিব। কিন্তু আমি তাকে বলি, আরো অনেক দাতব্য কাজ রয়েছে যেখানে তিনি অবদান রাখতে পারেন। ওয়াকফে জাদীদের এই যে পাঁচ হাজার, এটি আমাকেই দিতে হবে। যাহোক আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া এবং সদিচ্ছা কবুল করে আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন।

ফিজী, এটিও একটি অত্যন্ত দূরবর্তী অঞ্চল। সেখানে যয়নুল বেগ সাহেব নামের একজন নও মোবাঈ রয়েছেন। দু'তিন বছর পূর্বে তিনি বয়আত গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিকভাবে তাঁকে যখন বিভিন্ন তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন সামান্য কিছু ওয়াদা করেছিলেন। এর কিছুদিন পর চাঁদায়ে আম-এও অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিন্তু এ বছর আমার যে খুতবা ছিল সেগুলো শুনে নেযামের গুরুত্বের বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করেন। উল্লিখিত ব্যক্তি নিজেই তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা বৃদ্ধি করে দেন, বরং দশ গুণ বৃদ্ধি করেন এবং পরিশোধও করে দেন। এরপর চাঁদায়ে আম সম্পর্কে বলেন, সাপ্তাহিক আয়ের ১৬ভাগের ০১ভাগ প্রদানের শর্তে ওয়াদা করেন এবং নিয়মিত প্রত্যেক সপ্তাহে নিজ বেতন থেকে চাঁদা প্রদান করে যেতেন। এই নও মোবাঈ বর্ণনা করেন, চাদা বৃদ্ধি করার পর আমার চাকুরিতে পদোন্নতি হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে আমার বেতন আরো বৃদ্ধি করা হবে ইনশাআল্লাহ্। তিনি বলেন, যদি কেউ চাঁদার বরকত সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে।

মাইক্রোনেশিয়ার মোবাল্লেগ শারজিল সাহেব বলেন, এখানে একজন নও মোবাঈ আছেন, নাম সাইমন সাহেব। আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে যখন তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় এবং বলা হয় যে, এই চাঁদা আমরা খোদা তা'লার ভালোবাসা লাভের উদ্দেশ্যে প্রদান করে থাকি, এটি কোনো ট্যাক্স নয় আর খোদা তা'লা এটিকে একপ্রকার 'কারযায়ে হাসানাহ' [অর্থাৎ উত্তম ঋণ] আখ্যা দিয়েছেন, তখন থেকে উল্লিখিত ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে চাঁদা দেয়া শুরু করেন। এর স্বল্পকাল পর তিনি এসে বলেন, পূর্বে আমি গীর্জায় যেতাম এবং অর্থকড়ি প্রদান করতাম কিন্তু তখন আমার জীবনে কোনো পরিবর্তন আসে নি কিন্তু যখন থেকে আমি জামা'তে আহমদীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার পথে আর্থিক কুরবানী করা শুরু করেছি তখন থেকে আল্লাহ্ তা'লা এমন এমন মাধ্যম থেকে আমার প্রয়োজন পূর্ণ করেন যা দেখে আমি হতবাক হই।

অনেক সময় অর্থের প্রয়োজন পড়ে আর হঠাৎ-ই কেউ একজন এসে টাকা হাতে ধরিয়ে দেয়। কখনো খাবারের অভাব দেখা দেয়। তখন ঘরে থাকতেই আল্লাহ্ তা'লা কারো মাধ্যমে প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সায়মন সাহেব সাধ্যাতীত আর্থিক কুরবানী করেন।

তানযানিয়ার আমীর সাহেব বলেন, বশীর সাহেব নামের এক বন্ধু ওয়াকফে জাদীদ খাতে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নামে চল্লিশ হাজার শিলিং চাঁদা প্রদান করেন। তাঁর স্ত্রী বলেন, ঘরের আর্থিক অবস্থা অতটা স্বচ্ছলও না তা সত্ত্বেও এত বিশাল অংকের অর্থ কেন চাঁদা দিয়েছেন? তিনি উত্তরে বলেন, চিন্তা করো না, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে আর্থিক কুরবানীকারীদের কখনো ব্যর্থ করেন না রবং তিনি অবশ্যই আরো বাড়িয়ে ফেরত দিবেন। ঠিক-ই কয়েক দিনের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন দু -তিনটি স্থান থেকে এমন কাজ পেলেন যে, প্রদানকৃত চাঁদার সম্পূর্ণটাই কেবল ফেরত পেলেন, তা-ই নয় বরং আরো অধিক আয় হয়েছে। তিনি বলেন, আমি পূর্বেই [আর্থিক কুরবানীর] এ বিষয়টি বুঝতাম কিন্তু এখন আমার স্ত্রীও স্বচক্ষে চাঁদা আদায়ের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করল এবং তাঁর ঈমান বৃদ্ধি পেল।

জার্মানির ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ বলেন, মাইনয জামা'তের এক ছাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তির জন্য আবেদন করে। পড়াশুনার জন্য তার কিছু অর্থকড়ির প্রয়োজন ছিল আর বলে যে, আমার সেমিস্টার শুরু হতে যাচ্ছে কিন্তু হাতে পর্যাপ্ত অর্থ কড়ি নেই। অন্যদিকে ওয়াকফে জাদীদের বছরও শেষ হয়ে যাচ্ছিল, নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধযোগ্য ছিল । যাহোক যেখানে আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন, তার আশা ছিল সেখান থেকে কিছু টাকা বৃত্তিহিসেবে লাভ হবে। কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনপত্রটি নাকচ করে দেয়া হয়। অতএব তার কাছে যৎসামান্য যে অর্থ ছিল তার পুরোটা সে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে চাঁদা দিয়ে দেয়। এরপর ভালো নাম্বার পেয়ে সেমিস্টার শেষ করে। তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা সফলতা দান করেন আর সংশ্লিষ্টু প্রতিষ্ঠান থেকেও হঠাৎ (পূর্বে তো নাকচ করা হয়েছিল) চার হাজার ইউরো সমপরিমান অর্থ তাঁর একাউন্টে চলে আসে। সে বলে, আমার বিশ্বাস,

কুরবানীর কারণেই (এমনটি হয়েছে)।

ভারতের একটি জায়গার নাম 'সামিত ওয়াড়ী'। সেখানের এক আহমদীর নাম সিরাজ সাহেব। তিনি বলেন, আমি আর্থিক কুরবানীর বরকত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। করোনা মহামারীর ফলে আমার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা বকেয়া ছিল। দু -তিন বছর ধরে উল্লিখিত ব্যক্তির বাগানের কাঠ বৃষ্টির পানির কারণে নষ্ট হচ্ছিল। যে ক্রেতা সেই কাঠ ক্রয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং যে পরিমান অর্থ নির্ধারণ হয়েছিল তা পরিশোধ করছিল না। যাহোক, তিনি ক্রেতা খুঁজতে থাকেন কিন্তু কাউকেই পাচ্ছিলেন না। তিনি বলেন, ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ এসে যখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিতে বলেন তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দুই হাজার রুপি বের করে প্রদান করেন। তিনি বলেন, দু'দিনের মাঝেই যে ক্রেতা মূল্য নির্ধারণ করার পরও জিনিস নিচ্ছিল না, হঠাৎ-ই এসে বিশ হাজার রুপি দিয়ে সমস্ত কাঠ নিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস হলো, চাঁদার বরকতে আল্লাহ্ তা'লা দুই হাজারকে বৃদ্ধি করে আমাকে বিশ হাজার ফেরত দিয়েছেন অন্যথায় যে জিনিস বছরের পর বছর নষ্ট হচ্ছিল তা আগামীতেও নষ্ট হতে পারতো।

কানাডার এক লাজনা সদস্যা বলেন, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমি যখন ওয়াকফে জাদীদের নব-বর্ষের ঘোষণা দিয়েছিলাম তখন তাঁরও নিজের ও নিজ সন্তানের পক্ষে চাঁদা প্রদানের আগ্রহ জন্মে। যখন ব্যাংকে খবর নিলেন তখন দেখলেন সেখানে কোনো টাকা ছিল না। যাহোক তিনি বলেন, আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে যেন এমন উপকরণ সৃষ্টি করে দেন যাতে আমি চাঁদা দিতে পারি। এর কয়েক দিন পর ব্যাংক একাউন্টে তিন'শ ডলারের সমপরিমান অর্থ জমা হতে দেখলাম । এ অর্থ ঠিক ততটাই ছিল যতটা আমি এবং আমার পরিবারের প্রয়াতদের পক্ষ থেকে চাঁদা হিসেবে দিতে চাচ্ছিলাম আর তাৎক্ষণিক আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চাঁদা দিয়ে দিই।

কানাডার আরো এক বন্ধু, ইনিও একজন মহিলা। তিনিও নিজ ওয়াদা বাড়িয়ে পুরোটা আদায় করে দেন। পরবর্তী দিনইতিনি রাজস্ব বিভাগ থেকে অতিরিক্ত অর্থের চেক ফেরত পান যার পরিমান ছিল সাত শত ডলার। তিনি বলেন, ঠিক এই পরিমান অর্থই আমি চাঁদা প্রদান করেছিলাম।

তানজানিয়ার একজন নও মোবাঈ মহিলা, নাম আমেনা সাহেবা। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন আর বলেন, আহমদীয়াতের মাঝে আমি এক ভিন্ন ব্যবস্থাপনা দেখেছি যেটি অপরাপর মুসলমানদের থেকে ভিন্ন ছিল। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক চাঁদার রশিদ প্রদান করা হয় যেমনটি অন্য কোথাও দেখা যায় না। তিনি বলেন, নভেম্বর মাসে মোয়াল্লেম সাহেব জুমুআর খুতবা প্রদান করেন আর ওয়াকফে জাদীদের চাদা দেয়ার আহ্বান জানান। (এটি শুনে) আমার কাছে যতটাকাছিল তার পুরোটা চাঁদা হিসেবে প্রদান করি। আমার ঘরের অর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। আমার সন্তানসম্ভবা কন্যা ছিল, যেকোনো সময় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারতো। ঘরে ফি রলে রাতে এশার পর আমার কাছে এক ব্যক্তির ফোন আসে। তিনি দুই বছর পূর্বে আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল এবং কোনোরূপ যোগাযোগ করছিলনা আর আমি ভুলেও গিয়েছিলাম কেননা সেটি ফেরত পাওয়ার কোনো আশা ছিল না। যাহোক, সে ফোন করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং কারণ দর্শি য়ে প্রদেয় ২হাজার ফেরত দেয়। তিনি বলেন, আমার প্রয়োজন উপেক্ষা করে আমি যে আর্থিক কুরবানী করেছিলাম। এর বদৌলতে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সাহায্য করেছেন। পরবর্তীতে তার মেয়েকেও দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং আল্লাহ তা'লা এভাবে সাহায্য করেছেন আর তার চিকিৎসাও হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা নব-দীক্ষিতদের মাঝেও এ চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করছেন যে অর্থ কড়ি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আসে আর এ চিন্তা-চেতনাকেবল একজন আহমদীর মাঝেই পরিলক্ষিত হয়।

আরেকটি দেশের নাম নাইজার। বর্তমানে সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতিও খুবই আশান্ত । মোয়াল্লেম সাহেব বলছেন, আমরা মারাদি অঞ্চলের একটি গ্রামে যাই এবং চাঁদা প্রদানের জন্য আহ্বান জানাই। লোকেরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ওয়াকফে জাদীদের চঁ াদায় অংশগ্রহণ করে। সেখানকার একজন অ-আহমদী ব্যক্তি বলে উঠে, আপনি আমাদের গ্রামের গরীব লোকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করছেন অথচ আপনার ভালোভাবে জানা আছে, দেশের অর্থনৈতিক মন্দা চলছে আর অন্যান্য ইসলামি সংগঠনগুলো তো লোকদের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসছে পক্ষান্তরে আপনি তাদের কাছে চাঁদা চাচ্ছেন! মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, আমি উত্তরে কিছু বলার পূর্বেই সে গ্রামের একজন আহমদী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যান। খুবই উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, অন্যান্য ইসলামি দলগুলো আসে ঠিক-ই; কেউ জনকল্যাণমূলক সহায়তাও করে থাকে তা-ও ঠিক হবেকিন্তু কোনো ইসলামি সংগঠন কি আমাদেরকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কিছু শিখিয়েছে? তারা হয়তো জনহিতকর কাজ করে চলে যায় কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত আমাদেরকে ধর্ম শিখায়। এছাড়া এখানে মোয়াল্লেম সাহেব আমাদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করতে আসেন নি বরং আর্থিক কুরবানীর সে প্রেরণা সঞ্চারের জন্য এসেছেন যা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে সাহাবাগণ (রা.) উপস্থাপন করেছেন, যার মাধ্যমে আমরা কেবল ইহকালেই নয় বরং পরকালের প্রতিদানও অর্জন করতে পারব। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে আহমদীয়াত গ্রহণের পর এ উপলব্ধি সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানী করা আবশ্যক তবেই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রভূত কল্যাণ লাভ হয়। যাহোক এ কথা শুনে সে অ-আহমদী বন্ধু নির্বাক হয়ে যায়।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ)-কে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে কী চমৎকার নিষ্ঠাবান লোক প্রদান করেছেন। এই তালিকা অনেক দীর্ঘ । কার ঘটনা বলব আর কারটা ছাড়ব- এই সিদ্ধান্ত নেয়া আমার জন্য কঠিন ছিল কেননা এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। যাহোক, সময়ের কথা বিবেচনা করে আমি সবটা নিতে পারি নি কিন্তু যাদের ঘটনা আমি উল্লেখ করতে পারি নি তাদের মাঝেও নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি ছিল না। তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এসব ত্যাগ স্বীকার করেছেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও কারো ঋণ রাখেন না বরং তাদের কুরবানীসমূহ গ্রহণ করে সেটিকেতাদের ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম বানিয়ে দেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "আমার প্রিয় বন্ধুরা! আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাকে আপনাদের প্রতি সহমর্মিতার এক সত্যিকারের আবেগ ও উদ্দীপনা প্রদান করেছেন এবং আপনাদের ঈমান ও তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমাকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। আপনাদের ও আপনাদের বংশধরদের এ তত্ত্বজ্ঞানের একান্তপ্রয়োজন রয়েছে। অতএব আমি একান্তভাবে চাই যে আপনারা আপনাদের পবিত্র অর্থ দ্বারা ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহায়তা করুন আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা যতটুকু শক্তি, ক্ষমতা ও সামর্থ্য দিয়েছেন এক্ষেত্রে অর্থ প্রদান করতে যেন কোনোরূপ দ্বিধা না করে এবং আল্লাহ্ ও তার রসূল (সা.)-এর চেয়ে নিজ সম্পদকে প্রাধান্য না দেয় ।আর অন্যদিকে আমি আমার সাধ্যানুযায়ী বিভিন্ন রচনা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে খোদা তা'লার পবিত্রাত্মা প্রদত্ত জ্ঞান ও কল্যাণরাজিসমূহ এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিব। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১৬)

অতএব এ সকল আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে ইসলাম প্রচারের যে কাজ হওয়ার ছিল তা চলমান রয়েছে। আফ্রিকার দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের আহমদীরা নিজেদের কুরবানীর উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও ইসলামের তবলীগ ও প্রচারের কাজকে শুধু নিজেদের দেশেই সুচারুরূপে সম্পাদন করার বোঝা বহনে সক্ষম নন। এজন্য ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি ধনী দেশসমূহের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার বেশিরভাগ এসব দরিদ্র দেশগুলোতে জামা'তের উন্নতির কাজে ব্যয় করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা সেসব লোকদের ঈমান ও বিশ্বাস এবং ধন ও জনসম্পদে কল্যাণ দান করুন যারা কোননা কোনভাবে জামা'তের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন এবং সর্বদা এর জন্য প্রস্তুত থাকেন।

এখন ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা দেয়ার পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কুরবানীর কিছু পরিসংখ্যানও উপস্থাপন করবো, যা প্রচলিত রীতি।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ওয়াকফে জাদীদের ছেষট্টিতম (৬৬) বর্ষ সমাপ্ত হয়েছে এবং সাতষট্টিতম (৬৭) বর্ষের সূচনা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এ বছর এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার (১২৯৪১০০০) পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করেছে। অর্থাৎ প্রায় তেরো মিলিয়ন পাউন্ড। এই আদায় পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে সাত লক্ষ আঠারো হাজার পাউন্ড বেশি।

এই বছর সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে ব্রিটেন প্রথম স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয় হলো কানাডা। চাদায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যায় ভালো উন্নতি করেছে তারা। এই বছর এটি তাদের অনেক বড়ো অর্জন। তৃতীয়- জার্মানী, চতুর্থ আমেরিকা, পঞ্চম- পাকিস্তান, ষষ্ঠ- ভারত, সপ্তম- অস্ট্রেলিয়া, অষ্টম- মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, নবম- ইন্দোনেশিয়া, দশম- মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, একাদশ- বেলজিয়াম।

আফ্রিকার দেশগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে মরিশাস। দ্বিতীয়- ঘানা,

যুগ খলীফার বাণী

মোমেনদের জন্য নিজেদের আনুগত্যের মান ক্রমশ উন্নত করা একান্ত আবশ্যক। (খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Ayesha Begum, Harhari, Murshidabad

তৃতীয়- বুরকিনাফাসো, যদিও বুরকিনাফাসোর অবস্থা যথেষ্ট নাজুক; কিন্তু তা সত্ত্বেও আফ্রিকায় তারা তৃতীয় স্থানে রয়েছে। চতুর্থ - তানজানিয়া, পঞ্চম- নাইজেরিয়া, ষষ্ঠলাইবেরিয়া, সপ্তম- গাম্বিয়া, অষ্টম- মালি, নবম- উগান্ডা, দশম- সিয়েরালিয়ন।

অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এ বছর চুয়াল্লিশ হাজার নতুন নিষ্ঠাবান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মোট সংখ্যা পনেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার।

অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে যারা ভাল কাজ করেছে তাদের মাঝে প্রথম- কানাডা, দ্বিতীয়- তানজানিয়া, তৃতীয়ক্যামেরুন, চতুর্থ - গ্যাম্বিয়া, পঞ্চম- নাইজেরিয়া, ষষ্ঠ- গিনি বিসাউ, সপ্তম- কঙ্গো কিনশাসা।

আদায়ের দিক থেকে ব্রিটেনের দশটি বড়ো জামা'তের মাঝে এক নম্বরে ফার্নহ্যাম, দ্বিতীয়- উস্টার পার্ক, তৃতীয়ওয়ালসাল, চতুর্থ - অল্ডারশাট সাউথ, পঞ্চম- ইসলামাবাদ, ষষ্ঠ- জিলিংহ্যাম অ্যাশ, সপ্তম- চিম সাউথ, অষ্টম- ইউয়েল, নবম- হনসলো সাউথ।

রিজিয়নের মাঝে এক নম্বরে বায়তুল ফুতুহ। এরপর ইসলামাবাদ রিজিয়ন, এরপর মিডল্যান্ডস। এরপর মসজিদ ফযল ওবায়তুল ইহসান।

দফতর আতফালের দিক থেকে প্রথম দশটি জামা'ত হলো- ১. অল্ডারশট সাউথ ২. ফার্নহ্যাম ৩. অল্ডারশাট নর্থ অ্যাশ ৪. ইসলামাবাদ ৫. রোয়েম্পটন ৬. ইউয়েল ৭. সাউথ চিম ৮. ম্যানচেস্টার নর্থ ৯. বার্মিংহ্যাম ওয়েস্ট ১০. ব্র্যাডফোর্ড সাউথ।

ছোট জামা'তগুলোর মাঝে স্প্যান ভ্যালি, ক্যাথলি, নর্থ ওয়েলস, নর্থ হ্যাম্পটন, সোয়ানজি।

কানাডার ইমারতগুলোর মাঝে এক নম্বরে ভন তারপর যথাক্রমে ক্যালগেরি ও পিস ভিলেজ, ভ্যাঙ্কুভার, তারপর Brampton West (ব্র্যাম্পটন ওয়েস্ট) এরপর টরন্টো।

তাদের দশটি বড়ো বড়ো জামা'ত গুলোর মধ্যে হচ্ছে, মিলটন ইস্ট, মিলটন ওয়েস্ট, হ্যামিলটন, এডমিন্টন ওয়েস্ট, ডার্হাম ওয়েস্ট, অটোয়া ওয়েস্ট, রিজাইনা, ইনেসফিল্ড, অ্যাবটসফোর্ড, নিউফাউন্ডল্যান্ড।

দফতর আতফাল দপ্তরের দিক থেকে যেসব ইমারত উল্লেখ যোগ্য সেক্ষত্রে প্রথম হলো ভন (ঠধঁমযধহ) । এরপর যথাক্রমে পিস ভিলেজ, টরেন্টো ওয়েস্ট, ভ্যাঙ্কুভার, ক্যালগেরি এবং মিসিসাগা।

জামা'তের মধ্যে দফতর আতফালে ডার্হাম ওয়েস্ট প্রথম স্থানে আছে। এরপর মিলটন ওয়েস্ট, হাদিকা আহমদ, মন্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, হ্যামিল্টন মাউনটেন।

জার্মানির ইমরাত গুলোর মধ্যে হামবুর্গ প্রথম স্থানে আছে। তারপর ফ্রাঙ্কফুর্ট, উইসবাডেন, গ্রোস গেরাও, রেডস্টুট।

তাদের শীর্ষ দশটি জামা'ত গুলো হচ্ছে রোডমার্ক, রোডগাও, নিডা, ফ্রিডবার্গ, ফ্লোরেন্স হাইম, নইস, মায়েন্স, মাহদীয়াবাদ, ওসনো ব্রুক, বারলিন এবং কোবলেঞ্জ।

দফতর আতফালের ক্ষেত্রে মানহায়েম এক নাম্বারে এরপর ডিটসেনবাখ, হেসেন সাউথ-ওয়েস্ট, রাইন ল্যান্ড ফল্‌স, ওয়েস্ট ফালন।

আমেরিকার ১০ টি জামা'তের মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেস প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর মেরিল্যান্ড, নর্থ ভার্জিনিয়া, সিয়াটল, সিলিকন ভ্যালি, বোস্টন, অসটিন, অসকোশ, মিনিসোটা এবং পোর্টল্যান্ড।

দফতর আতফাল এর মধ্যে সিয়াটল, লস অ্যাঞ্জেলেস, মেরিল্যান্ড, সাউথ ভার্জিনিয়া, ক্লিভল্যান্ড, অস্টিন, সিলিকন ভ্যালি, অসকোশ, ইন্ডিয়ানা, যায়ান।

পাকিস্তানের জামা'ত গুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়া, তৃতীয় করাচি। আর জেলার ভিত্তিতে পূর্নবয়স্কদের মধ্যে ইসলামাবাদের নাম আমি শহরগুলোর মধ্যে প্রথম বলেছিলাম, এখন জেলার মধ্যেও প্রথমে আছে ইসলামাবাদ, এরপর ফয়সালাবাদ, গুজরানওয়ালা, গুজরাত, সারগোদা, ওমরকোট, মুলতান, হায়দারাবাদ, মিরপুর খাস, ডেরাগাজি খান।দফতর আতফালের মধ্যে তিনটি বড়ো জামা'ত হচ্ছে প্রথমে লাহোর, এরপর রাবওয়া আর তৃতীয়তে আছে করাচি।দফতর আতফাল জেলার দিক থেকে প্রথম স্থানে আছে ইসলামাবাদ, এরপর ফয়সালাবাদ, নারওয়াল, সারগোদা, ওমরকোট, গুজরানওয়ালা, মিরপুর খাস, গুজরাত, হায়দারাবাদ, শেখোপুরা।

পাকিস্তানে মুদ্রার মান অনেক কমে গেলেও আল্লাহর রহমতে তারা তাদের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করেছে এবং অনেক কুরবানী করেছে।

ভারতের শীর্ষ ১০টি প্রদেশ হলো, কেরালা, তামিলনাড়ু, জম্মু কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র।

যুগ খলীফার বাণী

"আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির প্রথম সোপান হল নামায।"

(ফিনল্যাণ্ডে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে, ২০১৯ সাল)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)**

চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে- হায়দ্রাবাদ, কোম্বেটুর, কাদিয়ান, কালীকাট, মানজিরী, বেঙ্গালুরু, মেলাপালিয়ালাম, কলকাতা, কেরোলাই এবং কেরেঙ্গা।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাপ্ত বয়স্কদের মাঝে শীর্ষ ১০টি জামা'ত হলো, মেলবোর্ন লঙ্গাওয়ারেন (Melbourne Langwarrin), ক্যাসেল হিল (Castle Hill), মার্সডেন পার্ক (Marsden Park), লোগান ইস্ট (LoganEast), মেলবোর্ন বেরভিক (Melbourne Berwick), প্যানরিথ (Penrith), পার্থ (Perth), মেলবোর্ন ক্লাইড, প্রামাটা এবং এডিলেইড ওয়েস্ট (Adelaide West)|

আল্লাহ্ তা'লা এই সকল আর্থিক কুরবানীকারীদের ধনসম্পদে ও প্রাণে প্রভূত বরকত দান করুন।

ফিলিস্তিনীদের জন্য তো আমি দোয়ার তাহরিক করেই যাচ্ছি, এখনও তাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। নিজ পরিচতদের মাঝে তাদের অধিকারের বিষয়ে আওয়াজ তুলতে থাকুন। লোকদেরকে বলতে থাকুন বিশেষ করে রাজনীতিবিদদেরকে বলুন, যেভাবে পূর্বেও আমি স্মরণ করিয়েছিলাম। ইসরাঈলী সরকার নিজেদের অত্যাচার থেকে বিরত হবে বলে মনে হচ্ছে না, বরং এখনতো তারা সৈনিকদেরকে বার্তা দিয়েছে যে ২০২৪ সালও যুদ্ধের বছর। আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনীদের প্রতি দয়া করুন। এখনতো ধারনা করা হচ্ছে পুরো অঞ্চলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পরার সম্ভাবনা রয়েছে আর বিশ্বযুদ্ধও সংঘটিত হতে পারে।

বৈরুতের আশপাশেও তারা বোমা বর্ষণ শুরু করে দিয়েছে। তারা এখন ক্রমশঃ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যদিও বাহ্যত মার্কিন সরকার তাদেরকে বলছে, নিজেদের যুদ্ধের পরিধি সীমিত কর, কিন্তু বাহ্যত এটি তাদের কথার কথা মনে হচ্ছে। এটি তারা চাপা স্বরে বলছে। তাদের আসল উদ্দেশ্য মনে হচ্ছে গাজা থেকে ফিলিস্তিনীদেরকে উৎখাত করে দেওয়া আর পুনরায় তাদের ভূমি দখল করে নেওয়া।

আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনীদের প্রতি দয়া করুন আর মুসলমানদের প্রতিও দয়া করুন। তাদেরকেও বিবেক বুদ্ধি দান করুন। আর এদিকেও যেন তারা দৃষ্টিনিবদ্ধ করে যে, যুগের ইমামের আহ্বান যেন শুনে ও তাঁকে মান্য করে।

****

২য় খুতবার শেষাংশ.....

পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তিনি জামা'তের বেশ কয়েকটি পদে আসীন থেকে সেবাদানের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদরও ছিলেন। প্রায় সারাটি জীবনই জামা'তের সেবায় কাটিয়েছেন। শত শত ছেলেমেয়েকে পবিত্র কুরআন পড়িয়েছেন। পর্দার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। মেয়েদেরকেও পর্দার বিষয়ে উপদেশ করতেন। সৃষ্টির সেবায় তিনি সানন্দে অংশগ্রহণ করতেন। দরিদ্র ও বিধবাদের প্রয়োজনের প্রতি যত্নবান ছিলেন। অনেক দরিদ্র ও এতিম মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন। বেশ কয়েকজন মেয়েকে সেলাই ও এমব্রয়ডারি শিখিয়েছেন। প্রতি জুমু'আর দিনে দুই ঘণ্টা পূর্বে মসজিদে চলে যেতেন। মহিলাদের অংশ নিজে পরিষ্কার করতেন। অতঃপর নফল নামায আদায় করতেন। তিনি অত্যন্ত ঈমানদার ছিলেন। তার সততার কারণে অনেক মহিলা তাদের গয়না-গাটি ও নগদ অর্থ তার নিকট আমানত (গচ্ছিত) রাখতেন। কখনোই তিনি কারো সাথে ঝগড়াঝাঁটি করেন নি, রুক্ষ ব্যবহার করেন নি, অভদ্রতা করেন নি। একান্ত উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারিনীছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি যখন ওসীয়্যত করেন তখন নিজের পাশাপাশি মেয়েদেরকেও ওসীয়্যত করিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি গ্রামে অনেক মহিলাকেও ওসীয়্যত ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তার স্বামী ছাড়াও এক পুত্র ও পাঁচ কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। মরহুমা সিয়েরালিওনের রাকীম প্রেসে কর্মরত মুরব্বী সিলসিলাহ্ মুকাররম উসমান আহমদ সাহেব এবং বু রকিনা-ফাসোতে কর্মরত মুরব্বী সিলসিলাহ্ মুকাররম সাআ'দাত আহমদ সাহেবের শাশুড়ি ছিলেন, আর তার দুই কন্যা যাদের বিয়ে মুরব্বী সাহেবদের সাথে হয়েছে তারা তাদের মায়ের জীবন সায়াহ্নে কাছে ছিলেন না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্মস্থলে ছিলেন। তার কন্যা আসিফা সাহেবা বলেন, আমি আমার স্বামী উসমান সাহেবের সাথে সিয়েরালিওনে সেবার সৌভাগ্য লাভ করছি। কর্মস্থ লে থাকার কারণে আমি মায়ের জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করতে পারি নি। অনুরূপভাবে আমার ছোট বোন মরিয়ম বুশরাও বু রকিনাফাসোতে থাকে; সে-ও অংশগ্রহণ করতে পারে নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন এবং মরহুমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। সন্তানসন্ততির পক্ষে তার দোয়াগুলো কবুল করুন।(আমীন)

****

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর নাম ফজলে উমর কেন রাখা হয়েছে?

-হযরত মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর একটি পরিচয় সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- 'ইলহামের মাধ্যমে আমার নিকট প্রকাশ করা হয়েছে যে এর একটি নাম হল ফজলে উমর। অর্থাৎ তার সেই সব শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাকে সনাক্ত করা যাবে যা হযরত উমর (বিন খাত্তাব) (রা.)-এর মাঝে বিদ্যমান আর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে এটি এমন এক বৈশিষ্ট্য যা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) ছাড়া পৃথিবীর আর অন্য কারো মাঝে পাওয়া যায় না।

(১)

আঁ হযরত (সা.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাবের যুগে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর দ্বিতীয় খলীফা হওয়ার সম্মান লাভ। যেমনটি হযরত উমর (রা.) (বিন খাত্তাব) তাঁর প্রথম আবির্ভাবের সময় হুযুর (সা.)-এর দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন। এই বিশেষত্ব এমন সুদৃঢ় এবং অবিচ্ছেদ্য যে হযরত ফযলে উমর এর পূর্বে এমন ব্যক্তির জন্ম হয় নি যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় খলীফা হওয়ার গৌরব লাভ করেছেন আর ভবিষ্যতেও এমন কোন ব্যক্তির জন্ম নিতে পারে না যে কি না এই পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে। এই ধারাবাহিকতায় তৃতীয়, চতুর্থ,পঞ্চম, বিংশতম- প্রত্যেক নম্বরের ন্যায় খলীফা আসতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় নম্বরের খলীফার ন্যায় কেউ আর আসবে না। যতদূর গায়ের মোবাইনদের প্রশ্ন, তারা তো প্রথম থেকেই খিলাফতের অমান্যকারী ছিল। আর যে কিছু মানুষ নিজেদের মুসলেহ মওউদ হিসেবে দাবি করছে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই জামাত আহমদীয়ার খিলাফত মসীহ মওউদ (আ.) এর দ্বিতীয় খলীফার হওয়ার ন্যায় মর্যাদা লাভ হয় নি, আর এমনটি কেউ দাবিও করে নি। সুতরাং মুসলহে মওউদকে সনাক্ত করার জন্য এটা এমন এক সুদৃঢ় নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যার মাঝে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর একজন ব্যক্তি ছাড়া কেউ পদের দাবিদার হতেই পারে না। আর গুণগত নাম থেকেই জানা যায় যে, মুসলেহ মওউদ কে? আর যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তবে এমন সুদৃঢ় নিদর্শন চারটি। ১) তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বংশধর। ২) তাঁর নয় বছরের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করা। ৩) প্রথম বশীরের অব্যহতি পরেই তাঁর জন্ম গ্রহণ করা। ৪) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের তাঁর দ্বিতীয় খলীফার পদে সমাসীন হওয়া।

(২)

এই বিশেষ গুণটি ছাড়াও হযরত উমর (বিন খাত্তাব) আরও কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যা হযরত ফযলে উমরের মধ্যে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেভাবে হযরত উমর এর যুগে ব্যপক জয় লাভ হয়েছিল আর ইসলামের প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছিল। অধিকাংশ সভ্যতার দেশে ইসলামী সেনা এবং মুবাল্লিগ পৌঁছে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে হযরত ফজলে উমর এর যুগেও আহমদীয়াত তথা ইসলামের মুবাল্লিগ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এবং পৃথিবীর অধিকংশ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। আর জামাতের বই-পুস্তক, পত্রিকা এবং ও সাময়িকি বিদেশের অধিকাংশ দেশে এবং নিত্যনতুন দেশে পৌঁছে গেছে। আর আহমদীয়াতের জয়যাত্রা, দাপট ও প্রসারের উপাখ্যান কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া হুযুরের জ্ঞানভাণ্ডার মানুষকে পরিতৃপ্ত করেছে। অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা.) সম্পর্কেও আঁ হযরত (সা.) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, একটি কুঁয়োর মধ্যে একটি বালতি রাখা আছে। আবু বাকার (রা.) অতি কষ্টে কুঁয়ো থেকে দু-এক বালতি জল তুললেন। অতঃপর সেই বালতিটি একটি চামড়ার থলেতে পরিণত হল। আর হযরত উমর (রা.) এর দ্বারা এত বেশি পানি উত্তোলন করলেন যে, মানুষ ও পশু সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। এটি ছিল দ্বিতীয় সাদৃশ্য যা হযরত ফযলে উমর এবং হযরত উমর (রা.)-এর মধ্যে বিদ্যমান।

(৩)

অনুরূপভাবে একবার আঁ হযরত (সা.) বলেন, আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে আমি দুধ পান করেছি, এতটাই যে, আমার নখ পর্যন্ত সতেজতা লাভ করে। অতঃপর আমি অবশিষ্ট দুধ উমর বিন খাত্তাব কে দিই। সাহাবাগণ নিবেদন করেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি? তিনি (সা.) বললেন, এর অর্থ জ্ঞান। ঠিক তেমনি, যেভাবে হযরত উমর (রা.) নবুয়তের জ্ঞান থেকে অংশ পেয়েছিলেন, অনুরূপভাবে হযরত ফজলে উমরও অংশ পেয়েছেন। শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁর এই অসাধারণত্বের গুণগ্রাহী যা নিয়ে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এতটুকু স্মরণ রাখা যথেষ্ট হবে যে, হযরত উমর (রা.)-এর কাজ করার শক্তি এবং তাঁর জ্ঞান, যে সম্পর্কে আমি ২ ও ৩ নম্বরে উল্লেখ করেছি, অনুরূপ অবস্থা হযরত ফজলে উমর এরও। কেননা, কাদিয়ানে বসবাসকারী প্রত্যেকের সামনেই শারিরিক কাজের শক্তি এবং জ্ঞানগত শক্তি-উভয়েরই প্রদর্শন হয়ে থাকে। আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ইলহামে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাকে এক পুত্র সন্তান দান করা হবে যে কি না উভয় শক্তির অধিকারী হবে। আর তাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে।

(৪)

হযরত উমর (রা.) নিজের এই বিষয়টি নিয়ে অনেক গর্ব করতেন যে, তিনি আঁ হযরত (সা.) কে কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেছেন আর এর পরেই তাঁর প্রশ্ন অনুসারে কুরআনের আয়াতও নাযেল হয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি হল পর্দা সংক্রান্ত আয়াত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে হযরত ফজলে উমর এর বয়স তেমন বেশি ছিল না যে, তিনি হুযুরকে কোন পরামর্শ দিতে পারতেন। কিন্তু একজন ইলহাম প্রাপকের বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যেও পাওয়া যায়। এর উদাহরণ হযরত ফজলে উমরের সেই স্বপ্নটি যাতে তিনি দেখেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর প্রতি إِنِّي مَعَ الْأَفْوَاجِ آتِيكَ بَغْتَةً ইলহাম হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, হ্যাঁ আজ রাতে সত্যিই আমার উপর প্রতি ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছে। তাই যেভাবে হযরত উমরের প্রতি খোদা তা'লার বাণী আঁ হযরত (সা.) এর ওহী হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে, ঠিক তদনুরূপ হযরত ফজলে উমর এর স্বপ্ন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ওহী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি ছিল চতুর্থ সাদৃশ্য।

(৫)

পঞ্চম সাদৃশ্য হল হযরত উমর (রা.) কে আঁ হযরত (সা.) এই দুনিয়াতেই জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও হযরত ফজলে উমরকে তাঁর সন্তান হওয়ার কারণে ইহজগতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যখন তিনি বলেছেন, বেহেশতের মাকবারার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমার ও আমার পরিবার সম্পর্কে খোদা তা'লা ব্যত্যয় রেখেছেন। .....আর এ বিষয়ে অভিযোগকারী মুনাফিক হবে। অর্থাৎ আমার স্ত্রী ও সন্তানকে খোদা তা'লা জান্নাতী বানিয়েছেন। আর তাদের জান্নাতী হওয়ার বিষয়ে তাঁর পক্ষ থেকে আমি সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি। এছাড়াও হযরত ফজলে উমরের জন্মের পূর্বে হুযুর (আ.) কেও ইলহামের মাধ্যমে বিশেষভাবে জান্নাতী হওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যেমনটি বলেছেন- "তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে।' অর্থাৎ 'মৌলবী মিশরীর কথার বিপরীতে প্রতিশ্রুত পুত্রের শুভ পরিণাম হবে এবং তার আত্মা আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে।

(এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলা সমীচীন হবে। পয়গামীরা বলে, অন্যদের জন্য এই মাকবারা বেহেশতি ছিল, কিন্তু মসীহ মওউদ এর পরিবারের জন্য এটি পারিবারিক মাকবারা। কেননা, তাদের পক্ষ থেকে ওসীয়্যতের কোন অর্থ জমা করা হয় নি। এর উত্তরে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, হুযুর আনোয়ার মাকবারার ভিত্তি স্থাপনের সময় নিজের সম্পত্তি থেকে সেই যুগের হিসেবে এক হাজার রূপীর জমি চাঁদা অর্থাৎ ওসীয়ত হিসেবে দান করেছিলেন। হুযুরের নিজের ওসীয়ত করার প্রয়োজন ছিল না, কেননা, তাঁকে তো উভয় পক্ষই ঐক্যমতভাবে জান্নাতী মনে করে। বস্তুত হুযুর এক হাজার রূপীর জমি তাঁর পরিবারের

যুগ ইমামের বাণী

খোদাতায়ালা আমাকে বারবার জানিয়েছেন, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপুত করে দিবেন। *- (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)*

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। **(সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)**

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (MSD)

পক্ষ থেকে দান করেছিলেন)

(৬)

হযরত উমর (রা.) এবং হযরত ফজলে উমর (রা.)-এর মাঝে ৬ষ্ঠ সাদৃশ্য তাঁদের প্রকৃতির। হযরত উমর (রা.) এর ধর্মীয় আত্মাভিমান এবং প্রতাপ সর্বজনবিদিত। অপরদিকে হযরত ফজলে উমর (রা.) সম্পর্কে ইলহাম রয়েছে- "তার আগমন বিশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে।" "এবং খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন।"

জামাতের সমস্ত মানুষ জানে যে, ধর্মীয় বিষয়ে মর্যাদাবোধ ও প্রতাপ হযরত ফযলে উমরের এক সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য, যেমনটি হযরত উমর (রা.)-এর ছিল।

(৭)

হযরত উমর (রা.)-এর সঙ্গে হযরত ফজলে উমরের ৭ম সাদৃশ্য হল তিনিও মুহাদ্দিস অর্থাৎ ইলহাম প্রাপ্ত এবং হুযুরের বিষয়ে খোদা তা'লা বলেছেন, 'আমরা তার মধ্যে স্বীয় আত্মা সঞ্চার করব। (অর্থাৎ বাণী)

অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, অতীতের মুহাদ্দিসদের ন্যায় উমরও একজন মুহাদ্দিস ও ইলহামপ্রাপ্ত। যেমন বহু আয়াতের বিষয়বস্তু প্রথমে হযরত উমরের হৃদয়ে নাযেল হয়েছে। অতঃপর কুরআন করীমে পঠিত ওহী রূপে নাযেল হয়েছে। এছাড়া তাঁর কিছু স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনও প্রসিদ্ধ আছে। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, আমার অব্যবহিত পরেই যদি কোন নবীর আগমণ ঘটত তবে সেটা উমর হত। কিম্বা তিনি বলেছেন, আমি আবির্ভূত না হলে উমর নবী হিসেবে আবির্ভূত হত। তাঁর এই সব গুণগুলি নবুয়তের জ্যোতি এবং ইলহাম প্রাপ্তির গুণ এবং ওহী সহন করার ক্ষমতার প্রতি নির্দেশ করে। অনুরূপ বিষয়গুলি জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা হযরত ফজলে উমরের মাঝেও চিরকাল দেখে আসছে। একবার আঁ হযরত (সা.) বলেন, এক ব্যক্তি নিজের গাভী নিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে সে ক্লান্ত হয়ে সে নিজে গাভীর উপর আরোহন করে। গাভী তাকে বলল, আমাদেরকে তো কৃষিকাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে,বাহন হিসেবে ব্যবহারের জন্য নয়। সাহাবাগণ খোদা তা'লার পবিত্রতা ঘোষণা করে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! গরুও কি কথা বলে? আঁ হযরত (সা.) বললেন, আমি তো একথা বিশ্বাস করি, এমনকি হযরত আবু বকর ও হযরত উমরও বিশ্বাস করে। যদিও তাঁরা দুজনে সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন না। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, আঁ হযরত (সা.) এর জ্ঞানে হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর দুজনেই কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শন লাভ করতেন। কেননা,গাভীর কথা বলার পুরো বিষয়টিই ছিল দিব্যদর্শনের। এর প্রমাণ হল, একবার তাঁর খিলাফতকালে হযরত উমর জুমআর খুতবা প্রদানের সময় 'ইয়া সারিয়াতাল জাবালইয়া সারিয়াতাল জাবাল বলে ডেকে ওঠেন। শ্রোতারা আশ্চর্য হয় আর জুমআর নামাযের পর এ বিষয়ে জানতে চায়। তিনি (রা.) বললেন, আমি ইসলমী সেনাকে যুদ্ধের ময়দানে ঘোর বিপদের সম্মুখীন হতে দেখেছি এবং সেই সঙ্গে এই দৃশ্যও দেখেছি যে, যদি তারা পর্বতের দিকে আশ্রয় নেয় তবে রক্ষা পেতে পারে। এই জন্য আমি সেনাপতির নাম নিয়ে বলেছি, পাহাড়ে আশ্রয় নাও, পাহাড়ে আশ্রয় নাও। কিছু কাল পর সেই সেনাদল মদিনা প্রত্যাবর্তন করল, তখন তারা বর্ণনা করছিল, 'আমরা শত্রুদের ডেরায় পোঁছে গিয়েছিলাম, কিন্তু একটি কণ্ঠস্বর ভেসে হল- হে সারিয়া পাহাড়ের আশ্রয়ে এস। এরপর আমরা পাহাড়ে চলে যাই এবং ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পাই। এটি একটি প্রসিদ্ধ দিব্যদর্শন যা প্রমাণ করে যে হযরত উমর (রা.) কাশফ বা দিব্যদর্শন দ্রষ্টা ছিলেন। অনুরূপভাবে মুসলমানরা আযানের বাক্যগুলি তাঁর মাধ্যমেই লাভ করেছে। যেহেতু তিনি নিজেই মুহাদ্দিস, কাশফ দ্রষ্টা এবং ইলহাম প্রাপক ছিলেন, সেই কারণে তাঁর পক্ষে একথা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল না যে গরু কিম্বা ছাগল কথা বলে। অবশ্য সাধারণ মানুষদের জন্য এটা সত্যিই ব্যাখ্যার বিষয় ছিল।

অনুরূপভাবে আমাদের ফজলে উমর শৈশব থেকেই কাশফ দ্রষ্টা এবং ইলহাম প্রাপক। 'ইউমাযযেকহুম' ১৯১৪ সাল থেকে তাঁর এই একটি ইলহাম পয়গামীদেরকে আজও পিষে চলেছে এবং তাদের উপর চিরতরে হুজ্জত (যুক্তি তর্কের পথ) পূর্ণ করছে। আর যেদিন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে, এই ধারা আরও ধারা আরও স্পষ্ট ও ব্যপক হয়ে দেখা দিচ্ছে। এটি ছিল সপ্তম সাদৃশ্য।

(৮)

হযরত ফজলে উমরের সাথে হযরত উমর (রা.) এর সঙ্গে ৮ম সাদৃশ্য যেমনটি আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা হযরত উমরের মুখে সত্য রেখেছেন। আর এক স্থানে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, খোদা তা'লা উমরের মুখ ও হৃদয়ে সত্য রেখেছেন। অনুরূপ বাক্য হযরত ফজলে উমর (রা.) সম্পর্কেও ঐশী ইলহামে বলা হয়েছে যেখানে তাঁকে مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ বলা হয়েছে এবং তাঁর আগমণে جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ বলা হয়েছে।

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَال

(অর্থাৎ-অতএব, সত্যের পর পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি আছে?) এটি ছিল ৮ম সাদৃশ্য।

(৯)

৯ম সাদৃশ্য ধর্মের বিষয়ে। আঁ হযরত (সা.) একটি স্বপ্নে দেখেন, মানুষ তাঁর সম্মুখে পেশ করা হচ্ছে যার কামিজ পরিহিত। কারো কামিজ বুক পর্যন্ত,কারো বা এর থেকে কম। এমতাবস্থায় হযরত উমর (রা.) কে আঁ হযরত (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করা হয়। তাঁর কামিজ এতটা দীর্ঘ যা মাটি স্পর্শ করছিল আর তিনি সেটা টেনে তুলছিলেন। সাহাবাগণ নিবেদন করেন, হুযুর (সা.)! এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি? আঁ হযরত (সা.) বললেন, (এর অর্থ) ধর্ম। এখানেও অনুরূপ অবস্থা। হযরত ফজলে উমর (রা.) এত বেশি পরিমাণ ধর্ম, কুরআন করীমের তত্ত্বজ্ঞান ও মারেফাত দান করা হয়েছে যে, জলসায় আগমণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, তাঁর সভায় উপস্থিত থাকা ব্যক্তি এবং খুতবা শ্রবণকারী এবং তাঁর বই পুস্তক তফসীর অধ্যয়নকারীর হৃদয় এই বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত যে, সত্যিই এই ব্যক্তি ধর্ম এবং খোদার বাণীর তত্ত্বজ্ঞানে আপাদমস্তক এমনভাবে পরিপূর্ণ যেভাবে ব্লটিং পেপার পানিতে ডোবালে সেটি পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অনুরূপে তাঁর প্রতিটি রন্ধ্র থেকে ধর্ম ফুটে বেরোচ্ছে। আর আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, নবুয়তের ন্যায় মহান বিষয়ের তাৎপর্য হুযুরের কারণেই জামাতের নিকট স্পষ্ট হয়েছে।

(১০)

দশম সাদৃশ্য হল আঁ হযরত (সা.) মক্কায় দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্ আবু জাহলকে মুসলমান বানিয়ে অথবা উমর বিন খাত্তাবকে মুসলমান বানানোর মাধ্যমে ইসলামকে সম্মানীয় ও বিজয়ী করে দাও। হযরত উমরকে খোদা তা'লা মুসলমান বানিয়ে দিলেন আর তাঁর কারণে ইসলামের সাহায্য, সম্মান ও বিজয় কিছুটা দ্রুত প্রকাশ পেল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর খিলাফতকালে এত বেশি বিজয় ও সাহায্য ইসলাম লাভ করল যা বর্ণনা করার সম্ভব নয়। তদনুরূপ হযরত ফজলে উমরও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চল্লিশ দিন-রাত্রির দোয়ার পরিণামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন,'আমার সন্তানদের মাধ্যমে খোদা তা'লা ইসলামের উন্নতি ও সাহায্যের ভিত্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই প্রতিশ্রুতিও আমরা এই মুসলেহ মওউদ এর যুগেই স্বমহিমায় পূর্ণ হতে দেখেছি। এরজন্য আল্লাহ্‌র প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

(১১)

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও জামাতের ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিটি জাতীয় বিভাগের পৃথক পৃথক নির্দিষ্টকরণ, শূরা ব্যবস্থার স্থাপনা, হিজরী সৌর সনের প্রবর্তন, বিভিন্ন ধরণের জামাতের আদমশুমারীর সূচনা, কবিতার শখ, বক্তব্য দানের সক্ষমতা, আমীরুল মোমেন এর উপাধিতে ভূষিত হওয়া, রাজনীতি ও পরিকল্পনা, মহিলাদের অধিকার এবং শিক্ষার ব্যবস্থা, ধর্মের জন্য ওয়াকফীনের ধারা পরিচালনা করা এবং আরও অনেক এমন বিষয় আছে যেগুলির ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায় এই যুগে তাঁর বিশেষ গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

(আল ফজল, ২০ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ এর সংখ্যায় প্রকাশিত)

যুগ ইমামের বাণী

অভিশপ্ত ঐ জীবন, যা কেবল দুনিয়ার জন্য এবং হতভাগ্য ঐ ব্যক্তি যার সকল চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার জন্য।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতঈন)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর অনুসরণ না করতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হতো, তা হলেও আমি কখনও খোদার সাথে বাক্যালাপ ও তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না।

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, kolkata

২পাতার পর.....

যাকে কালকের শিশু বলা হত, আমি সেই ব্যক্তি ছিলাম যাকে আহাম্মক ও নির্বোধ আখ্যায়িত করা হত। কিন্তু খিলাফত পদের দায়িত্বভার গ্রহণের পর আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি কুরআনীয় জ্ঞান এমন ভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যে, এখন কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুসলেমা আমার বই-পুস্তক পাঠ করে সেগুলি থেকে সহায়তা নিতে বাধ্য থাকবে। ইসলামের এমন কোন বিষয় নেই যা আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে পরিপূর্ণ বিবরণের সাথে উন্মোচন করেন নি। নবুয়ত, কুফর, খিলাফত, তকদীর, কুরআনের জরুরী বিষয়াদির রহস্য-উন্মোচন, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিগত তেরোশ বছর থেকে কোন ব্যপক ও বিস্তারিত প্রবন্ধ ও লেখনী ছিল না। খোদাতা'লা আমাকে ধর্মের সেবা করার তৌফিক দান করেছেন। আর আল্লাহ তা'লা আমার মাধ্যমেই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান উন্মোচিত করেছেন, আজ শত্রু-মিত্র সকলে অনুকরণ তার করছে। কেউ আমাকে যতই গালি দিক আর দোষারোপ করুক, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে ইসলামের শিক্ষার প্রসারে ব্রতী হবে তাকে আমার গুণগ্রাহী হতেই হবে। আর সে কখনই আমার অনুগ্রহের গণ্ডি থেকে বের হতে পারবে না। পয়গামী হোক বা মিশরী, তাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম যখনই ধর্মের সেবা করতে মনস্থির করবে,তারা আমার বই পুস্তক পাঠ করে সেগুলির সহায়তা নিতে বাধ্য হবে। বরং আমি কোন প্রকার অহংকার ছাড়াই বলতে পারি যে, এ বিষয়ে সমস্ত খোলাফাদের থেকে বেশি তথ্য ও উপাত্ত আমার মাধ্যমে একত্রিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। তাই আমাকে এরা যতই গালমন্দ করুক, যা-খুশি বলুক, কুরআন করীমের জ্ঞান যদি এদের ভাগ্যে জোটে তবে তা আমার মাধ্যমেই হবে। আর বিশ্ববাসী তাদেরকে একথা বলতে বাধ্য হবে যে, হে নির্বোধের দল! তোমাদের ঝুলিতে যা কিছু রয়েছে তা তোমরা তার কাছ থেকেই নিয়েছ। তোমরা কোন্ মুখে তার বিরোধিতা করছ।

(খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, পৃ: ৫৮৭)

১৯১০ সালের ২৯ শে জুলাই তিনি তাঁর জীবনের প্রথম জুমার খুতবা প্রদান করেন। উক্ত খুতবায় তিনি إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ -এর অজানা ও ঈমান উদ্দীপক তফসীর বর্ণনা করেন।

হিন্দুস্তানের স্বনামধন্য আলেম ও সাহিত্যিক মৌলানা আব্দুল মাজেদ দারিয়াবাদী হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সম্পর্কে লেখেন-

"কুরআন এবং কুরআনের জ্ঞানের বিশ্বজনীন প্রসার ও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘজীবন তিনি উদ্দীপনা ও সংকল্প নিয়ে যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে তার প্রতিদান দিন।"

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের প্রচার হয়েছে আর জামাত সারা বিশ্বে প্রসার লাভ করেছে। ১৯৪৪ সালে যখন তাঁর খিলাফতের কুড়ি বছর অবশিষ্ট ছিল, তখন আহমদীয়াত কিরূপ ব্যপকতা ও বিস্তার লাভ করেছিল তা লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন-

"আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ইসলাম আহমদীয়াতের প্রসারের জন্য মিশন প্রতিষ্ঠিত করেছি। যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মৃত্যুবরণ করেন সেই সময় ভারতে এবং আফগানিস্তানের কিয়দংশে জামাত আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্য কোথায় আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু যেমনটি খোদা তা'লা ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বিভিন্ন দেশে মিশন প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দান করেছেন। যেমন আমি আমার খিলাফতের শুরুতেই ইংল্যাণ্ড, সিওলোন, মরিশাসে মিশন প্রতিষ্ঠিত করেছি। এরপর এই ধারা ক্রমশ অগ্রসর হতে থেকেছে। ইরান,রাশিয়া, ইরাক,মিশর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন,লাগোস, নাইজেরিয়া,গোল্ডকোস্ট সিরালিওন, পূর্ব আফ্রিকা- ইংল্যাণ্ড ছাড়া ইউরোপের স্পেন, ইতালি, যুগোস্লোভিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, চেকোস্লেভিয়া, আলবানিয়া, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা,চীন, জাপান, মালায়া, স্ট্রীট সেটলমেন্টস, সুমাত্রা, জাভা, সুরাবাপা,কাশগড় প্রভৃতি দেশে খোদার কৃপায় মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু মুবাল্লিগ এই মুহূর্তে শত্রুদের হাতে বন্দী হয়ে আছেন। বাকিরা কাজ করছেন আর কিছু মিশন যুদ্ধ (অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) এর কারণে অস্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে। মোটকথা পৃথিবীর এমন কোন জাতি নেই যারা জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে অবগত নয়। এমন কোন জাতি নেই যারা একথা উপলব্ধি করে না যে আহমদীয়া জামাত একটি ক্রমবর্ধমান প্লাবনের নাম যা তাদের দেশের দিকে ধেয়ে আসছে। প্রতিটি দেশ এর প্রভাব অনুভব করছে। বরং কিছু কিছু দেশ এই জামাতকে দমন করার চেষ্টাও করছে। যেমন রাশিয়ায় যখন আমাদের মুবাল্লিগ যায় তখন তার উপর অনেক নির্যাতন করা হয়, কষ্ট দেওয়া হয়, প্রহার করা হয়, কিছু সময়ের জন্য জেলেও রাখা হয়। কিন্তু যেহেতু খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল যে তিনি এই সিলসিলাকে প্রসারিত করবেন আর আমার মাধ্যমে একে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি দান করবেন, তাই তিনি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে সেই সমস্ত স্থানে আহমদীয়াতকে পৌঁছে দিয়েছেন, বরং কিছু কিছু স্থানে বড় বড় জামাত প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।"

(দাওয়া মুসলেহ মওউদ কে মুতাল্লিক পুর শওকত এলান, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৭, পৃ: ১৫৫)

জনৈক আহমদী ডক্টর লতিফ আহমদ সাহেব বলেন-

একবার এক শ্রমিক নেতা আমার কাছে আসেন। তিনি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে এসেছিলেন এবং নিজের সফর বৃত্তান্ত শোনাতে গিয়ে বলছিলেন, আমি যুক্তরাষ্ট্রের সদর নিক্সন এর সঙ্গেও সাক্ষাত করেছি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গেও সাক্ষাত করেছি।চওয়ান লাঈকেও আমি দেখেছি, তাদের মধ্যে মাও জেদাং অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।' এতটুকু বলার পর হঠাৎ করে নির্বাক হয়ে পড়েন। তার দৃষ্টি অপলকে এক দিকে কি যেন দেখছিল। আমি দেখলাম দেওয়ালে টাঙানো হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি-র ছবির দিকে তিনি এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। সম্ভবত তিনি আমার বাড়ি আসার সময় যে জিনিসটি লক্ষ্য করেন নি। আমি তাঁর একাগ্রতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলাম- কি হল? তিনি বললেন, একথা সত্য যে মাওজেদাং এক মহান ব্যক্তিত্ব কিন্তু হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ -এর সঙ্গে জীবনে একবারই সাক্ষাত হয়েছিল যা আমি আমৃত্যু ভুলতে পারব না। তাঁর মত বুদ্ধিমান মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না। দুঃখের বিষয়, এমন বিরল ব্যক্তিত্বটি খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।"

(সোয়ানেহ ফজলে উমর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫৫১)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

'আমি মরে যাব, কিন্তু আমার নাম কখনও মুছে যাবে না। খোদা তা'লা আমার নাম ও কীর্তিকে জগতে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। এটা তাঁর সিদ্ধান্ত যা আকাশে গৃহীত হয়েছে।"

(জলসা সালানা ১৯১৯ এর সমাপনী ভাষণ)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ, আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ানের প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালি/রাঁধুনি/নানবাঈ/কেয়ারটেকার/চৌকিদার হিসেবে খিদমত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলী:

(১) প্রত্যাশীর বয়স ১৮ বছরে উর্দ্ধে এবং অনুর্দ্ধ ৪০ হতে হবে। * (২) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই, তবে শিক্ষিত প্রত্যাশীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। (৩) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। (৪) ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে। (৫) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। (৬) ইন্টারভিউ এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৭) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৮) প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ জানানো হবে।)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

Office: 01872-501130,

Mobile: 9682587713, 09682627592

ই-মেলঃ diwan@qadian.in

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: **Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)**

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর মর্যাদা

- হযরত মৌলবী শের আলি সাহেব (রা.)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার গ্রহণীয়তার এক সুমহান নিদর্শন। তাঁর আরও কিছু নিদর্শনও আছে যা তাঁর দোয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন লেখরাম সংক্রান্ত নিদর্শনটি। যদিও এই নিদর্শনটিও স্বস্থানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক শক্তিশালী প্রমাণ, কিন্তু মুসলেহ মওউদ এর প্রকাশ পাওয়া এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়া কবুল হওয়া অন্যান্য নিদর্শনাবলীকে ছাপিয়ে যায়। এই নিদর্শন সম্পর্কে হুযুর (আ.) বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত শহরের বাইরে নিভৃতে জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তা'লার নিকট অনুনয় বিনয় সহকারে দোয়া এবং যিকরে ইলাহিতে মগ্ন থাকেন। যার পরিণামে খোদা তা'লা হুযুর (আ.) কে এই রহমতের নিদর্শন দান করেন। দোয়ার গ্রহণীয়তার পরিণামে অন্যান্য যে নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে নিঃসন্দেহে সেগুলোও অসাধারণ ছিল, কিন্তু এই নিদর্শনের পরিণাম ছিল অকল্পনীয়।

দোয়ার পরিণামে এই ধরণের নিদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে মাত্র তিন বার প্রকাশ পেয়েছে। ১) প্রথম নিদর্শন আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শন ছিল যা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর দোয়ার পরিণামে প্রকাশ পেয়েছিল। এই নিদর্শনটি নিম্নোক্ত দুটি নিদর্শনের মধ্যে প্রথম স্থানে থাকবে।

২) দ্বিতীয় নিদর্শন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শন যা সেই সকল দোয়ার ফলে প্রকাশ পেয়েছে যা আঁ হযরত (সা.) তাঁর জাতির জন্য করেছেন। এই নিদর্শনটি এমন ধরণের নিদর্শনের ক্ষেত্রে মর্যাদার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নম্বরে থাকবে।

৩) দোয়া কবুল হওয়া সংক্রান্ত তৃতীয় আযিমুশ শান নিদর্শন যা পৃথিবীতে প্রকাশ পেয়েছে সেটি হল মুসলেহ মওউদ এর আবির্ভাব। এই নিদর্শন শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে তৃতীয় নম্বরে অবস্থান করছে। তিনি কি মহান ব্যক্তি যিনি তৃতীয় দোয়ার পরিণামে জন্ম গ্রহণ করেছেন! এটি অনুমান করা যায় সেই ঐশী বাণীর বাক্য থেকে যা সেই চল্লিশ দিনের দোয়ার পর হুযুর (আ.)-এর প্রতি হোশিয়ারে নাযেল হয়েছিল। ২০ শে ফেব্রুয়ারীর ইশতেহারে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

খোদার বাণীতে অতিরঞ্জকতা থাকতে পারে না। অতএব, আমরা যদি মুসলেহ মওউদ (রা.)এর মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে চাই, তবে আমাদের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পাঠ করা উচিত। কি অসাধারণ মর্যাদা সম্পন্ন সেই ব্যক্তি যাঁর প্রশংসা, গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব এবং কীর্তির রেখচিত্র এই ভবিষ্যদ্বাণীতে অঙ্কন করা হয়েছে। অতএব, তৃতীয় আযীমুশশান ব্যক্তি যিনি আঁ হযরত (সা.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পর দোয়ার পরিণামে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি হলেন মুসলেহ মওউদ যাঁর উল্লেখ এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে করা হয়েছে। এই বিষয়টি সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়ন স্থল হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.)। এটা কেবল নিদর্শন ও যুক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয় না। বরং খোদা ত'লার কর্মও উচ্চস্বরে সাক্ষী দিচ্ছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.) কেননা আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় শক্তিমত্তা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত সমস্ত বিষয় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.)-এর পক্ষে এমনভাবে পূর্ণ করেছেন এবং করে চলেছেন যা কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না। ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত বিষয়গুলি পূর্ণ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। খোদা তা'লাই এমনটি করতে পারতেন। তিনি এই সমস্ত বিষয়কে পূর্ণ করে উর্ধ্বলোক থেকে একথার স্বাক্ষী দিয়েছেন যে, মাহমুদই সেই আগমণকারী ব্যক্তি যার উল্লেখ ভবিষ্যদ্বাণীতে করা হয়েছিল। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার কর্মগত সাক্ষীই কোন ব্যক্তির সত্যতার সব থেকে বড় প্রমাণ হয়ে থাকে। এই প্রমাণটি এখানে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

আরও একটি বিষয় যা হযরত মুসলেহ মওউদ (আই.)-এর সপক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে সেটা হল এই যে, অতীতে খোদার প্রতিশ্রুত পুরুষের সঙ্গে তাঁর যেমন আচরণ হয়েছে, অনুরূপ আচরণ তাঁর সঙ্গেও হয়েছে। খোদার পক্ষ থেকে যে সব প্রতিশ্রুত পুরুষ জগতের সংশোধনের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রেরিত হয়েছেন,তাদের বিষয়ে খোদা তা'লার চিরাচরিত রীতি হল, তাদের জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের বিরোধিতর জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। তারা তাদেরকে ব্যর্থ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে ফিরাউন সব থেকে ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিল। সে হযরত মূসা (আ.)-এর বিরোধিতা করেছিল এবং হযরত মূসা ও তাঁর জাতিকে ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করেছিল। হযরত ঈসা (আ.) এর যুগে ইহুদীদের মধ্যে সব থেকে ক্ষমতাধর ব্যক্তি তাদের গণক নেতা ছিল যার নাম ছিল কাইফা। সে তাঁকে ব্যর্থ করার পুরো চেষ্টা করেছিল। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে মক্কা উপত্যকায় মক্কার সর্দার ছিল আবু জাহল যে আঁ হযরত (সা.)এর ঘোর বিরোধিতা করেছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে মুসলমানদের নেতা মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী এবং নাজির হোসেন দেহেলভী বিরোধিতা করার কারণে খোদা তা'লার ইলহামে তাদের নাম রাখা হয় যথাক্রমে ফিরাউন ও হামান। অনুরূপভাবে খোদার চিরাচরিত রীতি অনুসারে যখন মাহমুদের উঠে দাঁড়ানোর সময় হল, তখন আহমদী জামাতের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁর বিরুদ্ধে ঠিক সেই ভাবেই উঠে দাঁড়ায় যেভাবে অতীতের সংস্কারকদের যুগে সে যুগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অনুরূপভাবে তারা কর্মের মাধ্যমে এ কথার ঘোষণা করেছেন যে, যে- ব্যক্তি এখন দাঁড়াতে চলেছেন, তিনি সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যার সংবাদ দিয়েছিলেন জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা (আ.) ।

আরও একটি বিষয় যা হযরত ফজলে উমর হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.) প্রকৃত মর্যাদার বহিঃপকাশ ঘটায় সেটি হল, সিলসিলা আহমদীয়ার গোড়াপত্তন করা তাঁর জন্মের সঙ্গেই । হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কে যাদের নিষ্কলুষ মনোভাব ছিল আর হুযুর (আ.)-এর লেখনী এবং ভবিষ্যদ্বাণীর নিদর্শনাবলী দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং মনে করত যে, আল্লাহ্ তা'লা হুযুর কে মানবজাতির সংশোধনের জন্য মনোনীত করেছেন,তারা তাঁকে বার বার নিজেদের বয়আত গ্রহণের অনুরোধ করতেন। কিন্তু হুযুর (আ.) তাদেরকে সব সময় উত্তর দিতেন- 'এখনও আমাকে বয়আত গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয় নি। যতদিন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমাকে বয়আত গ্রহণের আদেশ না দেওয়া হয়, আমি কারো বয়আত নিতে পারি না।' কিন্তু যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.) জন্ম গ্রহণ করলেন, তখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ঐশী ইলহামের মাধ্যমে বয়আত গ্রহণের আদেশ প্রাপ্ত হলেন। তিনি ইলহাম প্রাপ্ত হলেন- اِصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا । অতঃপর তিনি এই ইশতেহারে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.) এর জন্মের সংবাদ প্রকাশ করেন এবং উক্ত ইশতেহারে মানুষকে বয়আতের আহ্বান জানিয়ে জামাতে আহমদীয়ার ভিত রচনা করেন। যতদিন হযরত খলীফাতুল মসীহর জন্ম হয় নি, খোদা তা'লা জামাতের বয়আত নেওয়ার বিষয়টি মুলতুবি রাখেন। তাই হযরত মুসলেহ মওউদ (আই.)-এর জন্মের সাথেই আদেশ নাযেল করে সিলসিলা আহমদীয়ার গোড়াপত্তন করেন। এইরূপে তাঁর জন্মের সাথে সিলসিলা আহমদীয়ার সূচনা হয়। এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, সিলসিলা আহমদীয়ার সঙ্গে সেই আশিসময় নবজাতকের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, এই দুইয়ের সূচনা একসঙ্গে হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, সিলসিলা আহমদীয়ার সঙ্গে তাঁর অস্তিত্বের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সব শেষে আমি একথা প্রকাশ করে দেওয়া জরুরী মনে করি। যেভাবে আমরা অ-আহমদীদের একথা বলি যে, তোমাদের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে গ্রহণ করা জরুরী কারণ তাঁর মাধ্যমে আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আর তাঁর অস্তিত্ব লাভ আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যতার নিদর্শন, যার মাধ্যমে আমরা ইসলামের বিরোধীদের উপর 'হুজ্জত' (অকাট্য যুক্তি দ্বারা পলায়নের সমস্ত পথ বন্ধ করা) পূর্ণ করতে পারি। অনুরূপভাবে গায়ের মোবাঈন সাহাবাদের নিকট নিবেদন করছি যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত ফজলে উমর এর মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সুমহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন আর তাঁর সত্যতার এক প্রতাপশালী নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। তাই আপনারা যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার উপর ঈমান আনয়নের দাবি করেন, এই নিদর্শনের সত্যতার উপর ঈমান আনা আপনাদের কর্তব্য আর আপনাদের আরও কর্তব্য পৃথিবীকে দেখিয়ে দেওয়া যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতাপশালী ভবিষ্যদ্বাণীকে নিদর্শনমূলকভাবে পূর্ণতা দানের মাধ্যমে তাঁর সত্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। এ বিষয়ে ভেবে দেখলে প্রত্যেক খোদা সন্ধানী এবং খোদাভীরু ব্যক্তির মাথা নত হয়ে যায়। কিন্তু আপনারা যদি হঠধর্মিতা এবং ঈর্ষাকাতরতার কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর এই উজ্জ্বল নিদর্শনকে অস্বীকার করেন,তবে আপনারাও খোদা তা'লার নিকট ঠিক সেই ভাবে অভিযুক্ত হবেন, যেভাবে খোদা তা'লার নিকট অ-আহমদীরা সেই প্রতিশ্রুত মসীহকে অস্বীকার করার দোষে দুষ্ট, যাঁর সত্তার মাধ্যমে আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে এবং যাঁর অস্তিত্ব আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যতার উপর এক প্রতাপশালী সাক্ষী। (আল ফজল, ২০ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪)

তদন্ত আদালতে মুসলেহ মওউদ (রা.) এর বিবৃতি দান

পাকিস্তানের তদন্ত আদালতে ১৯৫৪ সালের ১৩,১৪ ও ১৫ই জানুয়ারী সৈয়্যাদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর পক্ষ দেওয়া বিবৃতি তুলে ধরা হচ্ছে। তাঁর এই বিবৃতিতে ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত হয়। সেই সঙ্গে জামাত সম্পর্কে অ-আহমদী এবং ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভ্রান্ত বিশ্বাসেরও অপনোদন করা হয়েছে।

প্রশ্ন:রসুল কে?

উত্তর: সেই ব্যক্তিকে রসুল বলা হয় যাকে আল্লাহ্ তা'লা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সহকারে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের নিমিত্তে আবির্ভূত করেন।

প্রশ্ন: নবী ও রসুলের মাঝে কি কোন পার্থক্য আছে?

উত্তর: গুণগতদিক থেকে উভয়ের মাঝে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বাণী নিয়ে আসে তাকে রসুল বলা হবে, কিন্ত যাদের প্রতি সে ঐশী বাণী নিয়ে আসে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই একই ব্যক্তিকে নবী বলা হবে। এভাবে একই ব্যক্তিকে নবী ও রসুল উভয় বলা যায়।

প্রশ্ন: আপনার মতে আদম থেকে এখন পর্যন্ত কতজন রসুল বা নবী গত হয়েছেন?

উত্তর : সম্ভবত এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কোন সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। হাদীসে এই সংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন: আদম, নূহ, ইব্রাহিম, মুসা এবং ঈসা (আ.)- এঁরা কি সকলে রসুল ছিলেন?

উত্তর: আদমের বিষয়টি নিয়ে মতান্তর রয়েছে। অনেকে তাঁকে কেবল নবী হিসেবে বিশ্বাস করে, রসুল মনে করে না। কিন্ত আমার মতে তাঁরা প্রত্যেকেই রসুলও ছিলেন আর নবীও।

প্রশ্ন: ওলী কাকে বলে?

উত্তর: যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: মুহাদ্দিস কাকে বলে?

উত্তর : সেই ব্যক্তি যার সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলেন।

প্রশ্ন: আর মুজাদ্দিদ কাকে বলে?

উত্তর: সেই ব্যক্তিকে মুজাদ্দিদ বলে যে (ধর্মের) সংশোধন ও সংস্কার করে। মুহাদ্দিসেরই অপর নাম মুজাদ্দিদ।

প্রশ্ন: ওলী, মুহাদ্দিস ও মুজাদ্দিদের প্রতি কি ওহী হতে পারে?

উত্তর: হ্যাঁ, হতে পারে।

প্রশ্ন: তাঁদের প্রতি কিভাবে ওহী নাযেল হয়?

উত্তর: ওহীর অর্থ আল্লাহ্ তা'লার বাণী যা ওহী প্রাপকের উপর বিভিন্ন উপায়ে অবতীর্ণ হতে পারে। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার একটি পদ্ধতি হল ওহী প্রাপকের সামনে একজন ফিরিশতা উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, যে ব্যক্তির উপর ওহী হয় সে কিছু কিছু কথা শোনে কিন্ত বাণীর বাহককে দেখতে পায় না। ওহী লাভের তৃতীয় পন্থাটি হল পর্দার অন্তরাল থেকে অর্থাৎ স্বপ্নের মাধ্যমে।

প্রশ্ন: ফিরিশতাদের সর্দার হযরত জিবরাঈল কি কোন ওলী, মুহাদ্দিস বা মুজাদ্দিদের প্রতি ওহী নিয়ে আসতে পারেন?

উত্তর: হ্যাঁ, এমনকি উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতিও।

প্রশ্ন: একজন ওলী, মুহাদ্দিস কিম্বা মুজাদ্দিদের প্রতি নাযেল হওয়া ওহীর বিষয়বস্তু কি হতে পারে?

উত্তর: যার প্রতি ওহী হয় তার জন্য আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ বা ভবিষ্যতের সংঘটিত হতে চলা ঘটনাবলীর আগাম সংবাদ কিম্বা অতীতে নাযেল হওয়া পুস্তকের ব্যাখ্যা।

প্রশ্ন: আমাদের নবী করীম (সা.)-এর প্রতি কেবল জিবরঈল এর মাধ্যমেই ওহী নাযেল হয়েছিল?

উত্তর: একথা সঠিক নয় যে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি কেবল জিবরাঈলই ওহী নিয়ে আসতেন। তবে একথা সঠিক যে, ওহী কোন ওলীর প্রতি নাযেল হোক কিম্বা মুহাদ্দিস বা মুজাদ্দিদের প্রতি, সবই হযরত জিবরাঈল এর তত্ত্বধানে নাযেল হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: ওহী ও ইলহামের মাঝে পার্থক্য কি?

উত্তর : কোন পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন: মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের প্রতি কি হযরত জিবরাঈল ওহী নিয়ে আসতেন?

উত্তর : আমি পূর্বেই বলেছি, প্রতিটি ওহী হযরত জিবরাঈল এর তত্ত্বধানে নাযেল হয়ে থাকে। হযরত মির্যা সাহেবের ইলহাম থেকে জানা যায় যে, হযরত জিব্রাইল একবার তাঁর প্রতি দৃশ্যমান হয়েছিলেন।

প্রশ্ন: মির্যা সাহেব কি পরিভাষাগত অর্থের দিক থেকে নবী ছিলেন?

উত্তর:আমি কোন পরিভাষার অর্থ বুঝি না। আমি সেই ব্যক্তিকে নবী মনে করি যাকে আল্লাহ্ নবী বলে সম্বোধন করেছেন।

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তা'লা কি মির্যা সাহেবকে নবী বলেছেন?

উত্তর : জ্বি হ্যাঁ।

প্রশ্ন: মির্যা সাহেব সর্বপ্রথম কবে নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করেছেন? দয়া করে তারিখ জানাবেন। আর এ বিষয়ে তাঁর কোন লেখনীর উদ্ধৃতি দিন।

উত্তর: যতদূর আমার মনে আছে, ১৮৯১ সালে তিনি নবী হওয়ার দাবি করেন।

প্রশ্ন: একজন নবীর আবির্ভাবের ফলে কি এক নতুন জাতির সৃষ্টি হয়?

উত্তর : না।

প্রশ্ন: নবীর আবির্ভাবের ফলে কি এক নতুন জামাতের সৃষ্টি হয়?

উত্তর:জী হ্যাঁ।

প্রশ্ন: একজন নতুন নবীর উপর ঈমান আনা অন্যদের প্রতি তাদের মনোভাবের উপর প্রভাব ফেলে না?

উত্তর: যদি আগমণকারী নবী শরিয়তধারী হয় তবে এই প্রশ্নের উত্তর হল -হ্যাঁ। কিন্ত যদি সেই নবী নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে না আসে তবে অন্যদের প্রতি তার মান্যকারীদের মনোভাব নির্ভর করবে সেই আচরণের উপর যা অন্যরা তাদের সাথে করে থাকে।

প্রশ্ন: ভিন্ন অর্থে আহমদীরা কি একটি পৃথক শ্রেণী নয়?

উত্তর: আমরা কোন নতুন জাতি নই, আমরা মুসলমানদেরই একটি সম্প্রদায়।

প্রশ্ন: একজন আহমদীর প্রথম কর্তব্য দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা না কি তার জামাতের আমীরের প্রতি?

উত্তর: যে দেশে আমরা বাস করি সেদেশের সরকারের প্রতি আনুগত্যতা প্রদর্শন আমাদের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রশ্ন: ১৮৯১ সালের পূর্বে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কি বার বার একথা বলেন নি যে, তিনি নবী নন আর তাঁর ওহী নবুয়তের ওহী নয় বরং বিলায়ত (ওলী)-এর ওহী?

উত্তর:তিনি ১৯০০ সালে লিখেছিলেন যে, সেই সময় পর্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল যে, এক ব্যক্তি কেবল তখনই নবী হতে পারে যখন সে কোন নতুন শরিয়ত নিয়ে আসে। কিন্ত আল্লাহ্ তা'লা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, নবী হওয়ার জন্য শরিয়ত নিয়ে আসা জরুরী শর্ত নয়, একজন ব্যক্তি শরিয়ত না এনেও নবী হতে পারে।

প্রশ্ন: মির্যা সাহেব কি নিষ্পাপ ছিলেন?

উত্তর: যদিও নিষ্পাপ (উর্দু ও আরবীতে 'মাসুম') শব্দের অর্থ নবী কখনও কোন ভুল করতে পারে না, তবে এই অর্থের দিক থেকে কোন মানুষই মাসুম বা নিষ্পাপ নয়। এমনকি আমাদের নবী করীম (সা.)ও এই অর্থের দিক থেকে মাসুম বা নিষ্পাপ ছিলেন না। যখন মাসুম শব্দটি নবীর সম্পর্কে বলা হয় তখন এর অর্থ হয় সে যে শরিয়তের সে অনুসারী তার কোন আদেশ বিরুদ্ধ কাজ সে করতে পারে না। ভিন্নবাক্যে তার দ্বারা কোন প্রকারের গুরু বা লঘু পাপ সম্পাদিত হতে পারে না। বরং অপছন্দনীয় কাজও তার দ্বারা সংঘটিত হয় না। অনেক নবী এমনও গত হয়েছেন যারা কোন শরিয়ত নিয়ে আসেন নি। যে সব বিষয় শরিয়তের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় সে সব বিষয়ে নবী ব্যখ্যাসংক্রান্ত ভুল করতে পারে। যেমন দুই পক্ষের মধ্যেকার বিবাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুল করা অসম্ভব নয়।

প্রশ্ন: মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে কোন অর্থে আপনি মাসুম বা নিষ্পাপ বলছেন? আপনি এই প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিবেন?

উত্তর: তিনি এই অর্থে নিষ্পাপ ছিলেন যে, কোন সাগীরা বা কাবিরা (লঘু বা গুরু পাপ) পাপ করতে পারতেন না।

প্রশ্ন: আপনি কি একথা বিশ্বাস করেন যে, অন্যান্য মানুষের মত মির্যা সাহেবও বিচার দিবসে নিজের আমলের জন্য জবাবদিহি করবেন?

উত্তর: এটাই অনুমান করা যায় যে, তাঁকে নিজের আমলের হিসেব দিতে হবে না। আমাদের নবী করীম (সা.) বলেছেন, তাঁর উম্মতের বিপুল সংখ্যক মানুষ নবী নন, কিন্তু বিচার দিবসে তাদেরকে জবাবদিহি থেকে অব্যহতি দেওয়া হবে।

প্রশ্ন: মৃত্যুর পর আম্বিয়াগণের প্রতি কিরূপ আচরণ করা হয়? তারা

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: আমি আদম সন্তানের নেতা। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

কি সাধারণ মানুষের মত বিচার দিবস পর্যন্ত কবরের মধ্যে থাকে না কি সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করে?

উত্তর: আমার মতে আম্বিাগণের মৃত্যুর পর সরাসরি জান্নাতে যাওয়ার বিষয়টি সঠিক নয়। কিন্তু একথা সঠিক যে, তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার এক বিশেষ নৈকট্যের স্থানে পোঁছে যান। যেহেতু মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব নবী ছিলেন তাই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি যে বিশেষ আচরণ করে থাকবেন তা অবশ্যই সাধারণ আহমদীর প্রতি আচরণের থেকে ভিন্ন হবে।

প্রশ্ন: আপনি কি বিশ্বাস করেন যে মানুষের মৃত্যুর পর মুনকির ও নাকীর নামে দুই ফিরিশতা কবরের পাশে আসে?

উত্তর: মুনকির ও নাকীর নামে দুইজন ফিরিশতা অবশ্যই আছে, কিন্তু আমি একথা বিশ্বাস করি না যে, কবরে মৃতকে প্রশ্ন করার জন্য তারা বাহ্যিক রূপ ধারণ করে কবরে আসবে।

প্রশ্ন: মুনকির ও নাকীর কবরে কেন আসে?

উত্তর: মৃতকে তার কৃতকর্মের সংবাদ দেওয়ার জন্য।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন যে মুনকির ও নাকীর মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের কবরেও এসেছিল?

উত্তর: এটা জানার জন্য আমার কাছে কোন উপায় নেই।

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তা'লা আদমকে ক্ষমা করার পর যে জ্যোতি তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট করেছিলেন, মির্যা সাহেবও কি উত্তরাধিকার হিসেবে সেই জ্যোতি লাভ করেছিলেন?

উত্তর: এমন কোন সূত্র সম্পর্কে আমার জানা নেই। কুরআন করীম বা কোন সহীহ হাদীস থেকে এমন কোন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন: কুরআন করীমে হযরত মসীহ বা মাহদী সম্পর্কে কি কোন সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে?

উত্তর: কুরআন করীমে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয় নি।

প্রশ্ন: হাদীস কি মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের বিষয়ে ঐক্যমত?

উত্তর: এমন কোন হাদীস নেই যেখানে বলা হয়েছে যে, মসীহর আবির্ভাব ঘটবে না। তবে মাহদীর প্রসঙ্গে হাদীস থেকে প্রকাশ পায় যে, মাহদী ও মসীহ এক ও অভিন্ন সত্তার নাম।

প্রশ্ন: সমস্ত মুসলমান কি সর্ববাদিসম্মতভাবে এই হাদীসগুলিকে মানে?

উত্তর: না, মানে না।

প্রশ্ন: এই হাদীসগুলি থেকে কি প্রকাশ পায় না যে, মসীহ ও মাহদী দুই ভিন্ন ব্যক্তি হবেন?

প্রশ্ন: যে সব হাদীসে মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেই সব হাদীস অনুসারে দাজ্জাল বধ এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ ধ্বংস হওয়ার কত সময় পর ইসরাফিল বিগুলে ফুৎকার করবে?

উত্তর: আমি সেই সব হাদীসকে কোন গুরুত্ব দিই না।

প্রশ্ন: আপনি কি সেই সব হাদীসগুলি বিশ্বাস করেন যেগুলিতে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের উল্লেখ রয়েছে?

উত্তর: এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য আমাকে সেই সব হাদীসগুলি যাচাই করতে হবে। দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের উল্লেখ কুরআন করীমে রয়েছে।

প্রশ্ন: মসীহ ও মাহদী কি নবীর মর্যাদা লাভ করবেন?

উত্তর : আজ্ঞে,হ্যাঁ।

প্রশ্ন: তিনি কি জগতের বাদশাহ হবেন?

উত্তর: আমার মতে হবেন না।

প্রশ্ন: মসীহ জিহাদ রহিত করবেন কিম্বা জিজিয়া সংক্রান্ত আইনের বিলোপ ঘটাবেন - এ প্রসঙ্গে কি কোন হাদীস আছে?

উত্তর: একটি হাদীস রয়েছে জিজিয়া প্রসঙ্গে আর দ্বিতীয়টি জিহাদ প্রসঙ্গে। আমরা জিজিয়ার বিষয়ে হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি এবং অপরটিকে এর ব্যাখ্যা হিসেবে মনে করি। হাদীসে যে 'يَضَعُ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, আমি মনে করি না যে এর অর্থ বিলোপ করা। আমার মতে এর অর্থ স্থগিত করা।

প্রশ্ন: মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কি মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবি করেছেন?

উত্তর: আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রশ্ন: মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব হলে তাঁর প্রতি ঈমান আনা কি মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ?

উত্তর: আজ্ঞো হ্যাঁ। যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, এই দাবি সঠিক, তবে তাঁকে মান্য করার তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন: ইসলাম ধর্ম কি একটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার মিশেল?

উত্তর: এটা একটা ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা। কিন্তু এর মাঝে কিছু কিছু রাজনীতিক নির্দেশও রয়েছে যেগুলি এই ধর্মীয় ব্যবস্থাপনারই অংশ। এগুলি মান্য করা ততটাই জরুরী যতটা জরুরী অন্যান্য সব বিধিনিষেধ।

প্রশ্ন: এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে কাফেরদের স্থান কোথায়?

উত্তর: এই ব্যবস্থাপনায় কাফেররাও ততটুকু গুরুত্ব পাবে যতটুকু গুরুত্ব মুসলমানেরা পেয়ে থাকে।

প্রশ্ন: কাফের কাকে বলে?

উত্তর: কাফের,মোমেন এবং মুসলিম-এগুলি সব তুলনামূলক শব্দ, পরস্পরের সঙ্গে এগুলো সম্পর্কযুক্ত। এগুলির কোন স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই। কুরআন করীমে কাফের শব্দ আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়েছে আবার ব্যবহৃত হয়েছে তাগুত (শয়তান) সম্পর্কেও। অনুরূপভাবে মোমেন শব্দ তাগুত সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন: ইসলামী শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করার কাজে অংশগ্রহণ এবং উচ্চপদের কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে কাফের তথা অমুসলিমদের কি কোন অধিকার থাকতে পারে?

উত্তর: আমার মতে কুরআন করীম যে শাসনব্যবস্থাকে খাঁটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করেছে সেটা বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পরিভাষা অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের জন্য রাজনীতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরী। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

প্রশ্ন: ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বলে আদৌ কি কখনও কিছু প্রতিষ্ঠিত ছিল?

উত্তর: অবশ্যই ছিল। সেটা ছিল খোলাফায়ে রাশেদীনদের ইসলামী গণতন্ত্রের যুগ।

প্রশ্ন: এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কাফেরদের কি মর্যাদা ছিল? তারা কি আইন প্রণয়ন এবং আইন বলবৎ করার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারত? তাদের কি উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক পদের দায়িত্ব নেওয়ার অধিকার ছিল?

উত্তর: এই প্রশ্নটি সে যুগের প্রেক্ষিতে একেবারেই অবান্তর। কেননা, ইসলামী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার যুগে মুসলমান এবং কাফেরদের মাঝে ক্রমাগত যুদ্ধ হতে থেকেছে আর বিজীত কাফেররা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সেই সব অধিকারই লাভ করত যা মুসলমানরা ভোগ করত। বর্তমান যুগের মত সেই সময় নির্বাচিত সাংসদ ছিল না।

প্রশ্ন: আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে কি বিচার ব্যবস্থা পৃথক ছিল?

উত্তর: সেই সময় সব থেকে বড় আদালত স্বয়ং আঁ হযরত (সা.) ছিলেন।

প্রশ্ন: ইসলামী ধাঁচের শাসনব্যবস্থায় একজন কাফেরের প্রকাশ্যে নিজের ধর্মের প্রচার করার অধিকার কি আছে?

উত্তর: আজ্ঞো হ্যাঁ।

প্রশ্ন: ইসলামী শাসনব্যবস্থায় যদি কোন মুসলমান বিভিন্ন ধর্মকে যাচাই করার পর অকপটভাবে ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করে, যেমন-খৃষ্টান বা নাস্তিক হয়ে যায়, তবে কি সে সেই দেশের প্রজা হিসেবে যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়?

উত্তর: আমার মতে এমন তো হয় না। কিন্তু ইসলামে অন্যান্য এমন ফির্কা রয়েছে যারা এমন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ায় বিশ্বাসী।

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের দাবি সততার সাথে বিচার বিশ্লেষণ করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে,তাঁর দাবি ভুল ছিল, তবুও কি এমন ব্যক্তি মুসলমান থাকবে?

উত্তর: আজ্ঞো হ্যাঁ। সাধারণ পরিভাষায় তবু সে মুসলমান হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন: যারা ভ্রান্ত ধর্মীয় চিন্তাধারা বা বিশ্বাস পোষণ করেন, কিন্তু সেই ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি তারা সৎ। আপনারা মতে, আল্লাহ্ তা'লা কি তাদের শাস্তি প্রদান করবেন?

উত্তর: আমার মতে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের নীতি নির্ভর করে সততা ও সদিচ্ছার উপর, ধর্ম বিশ্বাসের সত্যাসত্যের উপর নয়।

প্রশ্ন: সমস্ত মুসলমানকে হুকুকুল্লাহ্ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সহ কুরআন ও সুন্নতের যাবতীয় বিধিনিষেধ পালনে বাধ্য করা কি কোন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধর্মীয় কর্তব্য?

উত্তর: ইসলামের মূল নীতি হল, পাপের দায় মানুষের ব্যক্তিগত। কোন ব্যক্তি কেবল সেই সব পাপের কারণে দায়ী হয় যেগুলি তার নিজের দ্বারা সংঘটিত হয়। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণ করলে তার জন্য তাকে নিজেই জবাবদিহি করতে হবে।

প্রশ্ন: গতকাল আপনি বলেছিলেন যে, পাপের দায়িত্ব ব্যক্তিগত হয়ে থাকে। ধরুন আমি একজন মুসলিম দেশের মুসলমান নাগরিক আর আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন ও সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখলাম। তাকে এই

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর,নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞানী।

(আল- আরাফ: ২০১)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita, Bangaingaon (Assam)

বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধা দেওয়া কি আমার ধর্মীয় কর্তব্য নয়? ধর্মীয় কর্তব্যের অর্থ হল আমি যদি এমনটি করতে বাধা না দিই তবে কি আমি নিজেও পাপী হব না?

উত্তর: আপনার কর্তব্য হল সেই ব্যক্তিকে কেবল উপদেশ দেওয়া।

প্রশ্ন: আমি যদি কর্তৃপক্ষ বা আদেশ দেওয়ার অধিকারী হই, তবুও কি একই কাজ করব?

উত্তর: তবুও এমন ব্যক্তিকে বলপূর্বক বাধা দেওয়া আপনার ধর্মীয় কর্তব্য নয়।

প্রশ্ন: আমি যদি আদেশ দেওয়ার অধিকারী হই তবে কি আমার কর্তব্য হবে এমন জাগতিক আইন তৈরী করার যা এই ধরণের (ধর্মের) বিরুদ্ধাচারণকারীদেরকে শাস্তিযোগ্য হিসেবে আখ্যায়িত করে?

উত্তর: না, এই কাজ করা আপনার ধর্মীয় কর্তব্য হবে না। কিন্তু এমন আইন তৈরী করার অধিকার আপনার থাকবে।

প্রশ্ন: একজন সত্য নবীকে প্রত্যাখ্যান করা কুফর নয়?

উত্তর: হ্যাঁ, এটা কুফর। কিন্তু কুফর দুই প্রকারের। প্রথম প্রকারের কুফর সেটা যার ফলে কোন ব্যক্তি ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়। দ্বিতীয়, যার ফলে সে ধর্ম থেকে থেকে বহিষ্কৃত হয় না। কলেমা তৈয়্যবার অস্বীকার করা প্রথম প্রকারের কুফর। দ্বিতীয় প্রকারের কুফর এর থেকে নিম্নমানের অপবিশ্বাস থেকে তৈরী হয়।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি এমন নবীকে মানে না যার আবির্ভাব রসুল করীম (সা.)-এর পরে হয়েছে, সে কি পরকালের শাস্তি ভোগ করবে?

উত্তর: আমরা এমন ব্যক্তিকে অবশ্যই অপরাধী মনে করি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে শাস্তি দান করবেন কি না তার বিচার করা খোদার কাজ, আমাদের নয়।

প্রশ্ন: আপনারা 'খাতামান্নবীঈন' শব্দে 'তা' কে 'জাবার' সহকারে উচ্চারণ করেন না কি 'জের' সহকারে?

উত্তর: দুটো উচ্চারণই সঠিক।

প্রশ্ন: এই শব্দের সঠিক অর্থ কি?

উত্তর: 'তা' -এর সঙ্গে 'জাবার' দিয়ে পড়লে এর অর্থ হবে আমাদের নবী করীম (সা.) অন্যান্য সকল নবীর সৌন্দর্য। যেভাবে অঙ্গুরীয় মানুষের জন্য সৌন্দর্যবর্ধক হয়ে থাকে। আর যদি 'জের' সহকারে পড়া হয়, তবে অভিধানগতভাবে এটাই তার মর্মার্থ হবে। কিন্তু এর দ্বারা সেই ব্যক্তিকেও বোঝানো হবে যে কোন কিছুকে সমাপ্ত করে। এই হিসেবে এর অর্থ হবে 'খাতামান্নাবীঈন' শেষ নবী। কিন্তু এক্ষেত্রে খাতামান্নাবীঈন বলতে সেই নবীকে বোঝানো হবে যার সঙ্গে শরিয়ত নাযেল হয়। অর্থাৎ শরিয়তধারী নবী।

প্রশ্ন: মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কোন্ অর্থে নবী ছিলেন?

উত্তর: আমি এই প্রশ্নের উত্তর ইতিপূর্বেই দিয়েছি। তিনি এই কারণে নবী ছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ওহীতে তাঁর নাম নবী রেখেছেন।

প্রশ্ন: মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের ন্যায় আধ্যাত্মিক মর্যাদা সম্পন্ন আর কোন ব্যক্তি কি ভবিষ্যতে আসতে পারে?

উত্তর: এর সম্ভাবনা আছে, কিন্তু একথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতে এমন ব্যক্তিবর্গকে আবির্ভূত করবেন কি না।

প্রশ্ন: কোন মহিলা কি নবী হতে পারে?

উত্তর: হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহিলারা নবী হতে পারে না।

প্রশ্ন: আপনার জামাতের কোন মহিলা কি এই অধিষ্ঠানে সমাসীন হওয়ার দাবি করেছে?

উত্তর: আমার জ্ঞানে কেউ এমনটি করে নি।

প্রশ্ন: জাহান্নাম কি চিরন্তন?

উত্তর: আজ্ঞে না।

প্রশ্ন: জাহান্নাম কী- কোন পশু, গতিশীল কোন বস্তু নাকি নির্দিষ্ট কোন স্থান?

উত্তর: জাহান্নাম হল আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত এক অবস্থা।

প্রশ্ন: ইমাম গাজালি (রাহে.) জাহান্নামকে এক পশু সদৃশ বস্তু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটা কি সঠিক?

উত্তর: এমন প্রতীত হয় যে, তিনি এই শব্দ রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন: ইসলামের কিছু সমালোচক একথা বলে থাকেন যে, যেমনটি একজন সাধারণ ধর্মীয় পণ্ডিত (মৌলভী) মনে করে, ইসলাম মানসিক দাসত্বকে স্থায়ী রূপ দিয়েছে। কেননা, তারা সততার সাথে বিরোধিতা করলেও বিরোধিদেরকে চিরকালের জন্য জাহান্নামী আখ্যায়িত করে থাকে।

উত্তর: আমার মতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা জাহান্নামকে চিরস্থায়ী মনে করে না।

প্রশ্ন: এর অর্থ কি এটাই যে, যে আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমাদান সেই সব মানুষ পর্যন্তও বিস্তৃত হবে যারা মুসলমান নয়?

উত্তর: অবশ্যই।

প্রশ্ন: এক অমুসলিম দেশে একজন মুসলমানের কর্তব্য কী দাঁড়াবে যদি সে দেশের সরকার এমন কোন আইন তৈরী করে যা কুরআন ও সুন্নতের পরিপন্থী?

উত্তর: সরকার যদি আইন তৈরী করার সময় সেই সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে যা সরকার হিসেবে সে করতে পারে তবে মুসলমানদের সেই সব আইন শিরোধার্য করা উচিত। কিন্তু যদি সেই আইন বিশেষ কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিষয়ে হয়ে থাকে, যেমন নামায পড়তে নিষেধ করে- তবে যেহেতু এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই মুসলমানদের এমন দেশ ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু যদি তা তুচ্ছ কোন বিষয় নিয়ে হয়ে থাকে তবে মুসলমানদের সেই আইন শিরোধার্য করা উচিত।

প্রশ্ন: একজন মুসলমান কি এক অমুসলিম দেশের প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারে?

উত্তর: অবশ্যই।

প্রশ্ন: যদি একজন মুসলমান কোন অমুসলিম দেশের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয় আর তাকে এক মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয় তবে সেক্ষেত্রে তার কর্তব্য কি হবে?

উত্তর: মুসলমান দেশটি সত্যের উপর আছে কি না তা দেখা তার কর্তব্য হবে। যদি সে মনে করে যে, মুসলিম দেশটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তবে তার কর্তব্য হবে নিজের কাজে ইস্তিফা দেওয়া। কিম্বা যেমনটি অন্যান্য দেশের নিয়ম, একথা ঘোষণা করে দেওয়া যে, এমন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা আমার কাছে বিবেক বিরুদ্ধ কাজ।

প্রশ্ন: **আপনার কি এই ঈমান আছে যে, মির্যা সাহেবও সেই অর্থে শিফায়াতকারী হবেন যেভাবে আঁহযরত (সা.) কে শাফায়াতকারী মনে করা হয়?**

উত্তর: আজ্ঞে না।

প্রশ্ন: আপনাদের জামাতে 'আল-ফজল'-এর কি ভূমিকা? এর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?

উত্তর: একথা সঠিক যে পত্রিকাটির পথ চলা শুরু আমার হাত ধরে। কিন্তু দুই-তিন বছর পরেই এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। সম্ভবত ১৯১৫ বা ১৯১৬ সালের কথা এটা। এখন এটি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবোয়ার মালিকানাধীন।

প্রশ্ন: ১৯১৫-১৬ সালের পর কি পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা আপনার হাতে ছিল?

উত্তর: হ্যাঁ, এদিক থেকে জামাত আমার প্রতি বিশ্বস্ত । আমি যদি তাদেরকে পত্রিকা কিনতে নিষেধ করি তবে পত্রিকার প্রকাশনা এমনিই বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: আপনি কি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়াকে এর প্রকাশনা বন্ধ করার পরামর্শ দিতে পারেন?

উত্তর: আমি পত্রিকার কর্ণধার আঞ্জুমানকেও এর প্রকাশনা বন্ধ করার পরামর্শ দিতে পারি।

প্রশ্ন: সাম্প্রতিক প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বে কি আপনি সেই সব মুসলমানদেরকে এতদিন কাফের এবং ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত বলেন নি যারা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে মানে না?

উত্তর: হ্যাঁ, আমি একথা বলেছি সেই সঙ্গে কাফের এবং 'ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত' শব্দের ব্যাখ্যাও দিয়েছি যেখানে এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন: বর্তমান প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বে আপনি না কি জামাতকে এই পরামর্শ দিতেন যে, তারা যেন অ-আহমদী ইমামের পিছনে নামায না পড়ে আর অ-আহমদীদের জানাযা না পড়ে এবং অ-আহমদী পরিবারে মেয়েদের বিয়ে না দেয়। একথা কি সঠিক নয়?

উত্তর: কিছু অ-আহমদী উলেমার এই ধরণের ফতোয়ার উত্তরে বলেছি, বরং আমি তাদের থেকে কম বলেছি। কেননা جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا।

প্রশ্ন: আপনি এখনই সাক্ষ্য দান করেছেন- যে ব্যক্তি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে মানে না তবু সে মুসলমান থাকে। প্রথম থেকেই কি আপনার এই একই দৃষ্টি ভঙ্গি থেকেছে?

উত্তর: আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রশ্ন: আহমদী ও অ-আহমদীদের মাঝে মতবিরোধ কি মৌলিক বা বুনিয়াদি?

উত্তর: আমাদের রসুল করীম (সা.) 'বুনিয়াদি' বা মৌলিক শব্দের যে অর্থ করেছেন যদি এর সেই অর্থই নেওয়া হয় তবে এটা মৌলিক বা বুনিয়াদি মতবিরোধ নয়।

প্রশ্ন: হয়তো আপনি জানেন কিম্বা জানেন না যে, নিম্নে যে আকিদাটির উল্লেখ করা হচ্ছে সেটি সাধারণ মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস- "যেমনটি মোমেনদের জন্য খোদা তা'লার অন্যান্য আদেশাবলীর উপর ঈমান আনা আবশ্যক, অনুরূপভাবে এ বিষয়ের উপরও ঈমান আনা আবশ্যক যে, আঁ হযরত (সা.) এর দুটি আবির্ভাব। একটি আবির্ভাব হল মহম্মদী যেটি প্রত্যক্ষ। দ্বিতীয় আবির্ভাবটি হল আহমদী যেটি পরোক্ষ।

উত্তর: সকল মুসলমানদের মতে এটি কেবল রসুল করীম (সা.)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আমাদের মতে এটি অবশ্যই আঁ হযরত (সা.)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু ছায়া হিসেবে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের জন্যও প্রযোজ্য।

প্রশ্ন: যদি বুনিয়াদি শব্দের অর্থ সাধারণ অর্থে নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কি বলবেন?

উত্তর: সাধারণ অর্থে এর অর্থ হবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অর্থের নিরিখেও মতবিরোধ মৌলিক নয়, আংশিক।

প্রশ্ন: পাকিস্তানে আহমদীদের সংখ্যা কত?

উত্তর: দুই থেকে তিন লাখের মাঝামাঝি।

প্রশ্ন: ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত তোহফায়ে গোল্ডবিয়া পুস্তকটি কি মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের রচনা?

উত্তর: আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রশ্ন: দয়া করে আল-ফজল পত্রিকার ১৯১৭ সালের ২১ শে আগস্ট এর প্রকাশনায় ৭নম্বর পৃষ্ঠায় ১ম কলামে দেখুন যেখানে আপনি আপনার জামাত ও অ-আহমদীদের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেছেন- 'অন্যথায় মসীহ মওউদ (আ.) তো বলেছেন যে, তাদের ইসলাম আর আমাদের ইসলামের মাঝে পার্থক্য রয়েছে, তাদের খোদা আর আমাদের খোদার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তাদের হজ্জ আর আমাদের হজ্জের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অনুরূপভাবে তাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে।' একথা কি সঠিক?

উত্তর: যে সময় একথা ছাপা হয়েছিল তখন সেটা আমার কোন ডায়েরির নোটস ছিল না। তাই নিশ্চিত করে বলা যায় না আমার কথা ঠিকমত উদ্ধৃত করা হয়েছে কি না। তবে এর ভাবার্থ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার বলার অর্থ এই ছিল যে, আমরা অনেক বেশি নিষ্ঠাসহকারে আমল করে থাকি।

প্রশ্ন: আনোয়ারে খিলাফত পুস্তকের ৯৩ পৃষ্ঠায় আপনি কি একথা লিখেছেন যে ' এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায়। প্রশ্নটি হল, অ-আহমদীরা তো হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অস্বীকারকারী। তাই তাদের জানাযা পড়া উচিত নয়। কিন্তু কোন অ-আহমদীর শিশু সন্তান মারা গেলে তার জানাযা কেন পড়া হবে না? সে তো মসীহ মওউদ (আ.)কে অস্বীকারকারী নয়। আমি প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যদি একথা সঠিক হয় তবে হিন্দু ও খৃষ্টানদের শিশুদের জানাযা কেন পড়া হয় না?"

উত্তর: হ্যাঁ, কিন্তু আমি এজন্য বলেছিলাম যে, অ-আহমদী উলেমারা ফতোয়া দিয়েছিল যে, আহমদী শিশুদেরও মুসলমানদের কবরস্তানে যেন দফন করতে না দেওয়া হয়। আসল ঘটনা হল, আহমদী মহিলা এবং শিশুদের মৃতদেহ কবর থেকে তুলে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।যেহেতু তাদের ফতোয়া এখনও বলবৎ রয়েছে, তাই আমার ফতোয়াও প্রতিষ্ঠিত আছে। এখন আমি জামাতের প্রতিষ্ঠাতার একটি ফতোয়া খুঁজে পেয়েছি। সেই ফতোয়া অনুসারে বিচার বিশ্লেষণের পর ফতোয়ায় কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব।

প্রশ্ন: মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব হাকীকাতুল ওহী পুস্তকের ১৬৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'তাছাড়া যে ব্যক্তি আমাকে মানে না সে খোদা ও তাঁর রসুলকেও মানে না।' এই লেখনী কি তাঁরই?

উত্তর: হ্যাঁ, এই কথাগুলি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন: আপনার জামাতে কি কোন 'মোল্লাও' রয়েছে?

উত্তর: 'মোল্লা' শব্দটি মৌলবীর সমার্থক আর এটা অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন নয়। মোল্লা আলি ক্বারী, মোল্লা শোর বাজার এবং মোল্লা বাকের প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব মোল্লা নামে পরিচিত। আর এই নামের সঙ্গে সম্মান ও গর্ব জড়িয়ে আছে।

প্রশ্ন: আল ফজলে প্রকাশিত ১৪/ হিজরত শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: এর অর্থ ১৪ই মে।

প্রশ্ন: আপনারা এই মাসটিকে হিজরত নামে কেন উল্লেখ করেন?

উত্তর: কেননা ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, রসুল করীম (সা.) মে মাসে হিজরত করেছিলেন।

প্রশ্ন: আপনারা কোন ক্যালেন্ডার ব্যবহার করেন- হিজরী সন না কি খৃষ্টাব্দ?

উত্তর: আমরা যেটুকু করেছি তা হল, রসুল করীম (সা.)এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে সৌর মাসগুলির ভিন্ন নামকরণ করেছি।

প্রশ্ন: '১৯১৯ সালের মার্চ মাসে সালানা জলসায় একটি অধিবেশনে আপনি বয়ান দিয়েছিলেন যা ইরফানে ইলাহি নামক পত্রিকার ৯৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। 'প্রতিশোধ গ্রহণের যুগ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে যে, 'এখন যুগের পরিবর্তন হয়েছে। দেখুন, প্রথম যুগের মসীহকে শত্রুরা ক্লুশবিদ্ধ করেছিল। কিন্তু বর্তমানের মসীহ বিরুদ্ধবাদীদের মৃত্যুদূত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।" এই বয়ান কি আপনারই?

উত্তর: হ্যাঁ, কিন্তু উদ্ধৃত বাক্যের ব্যাখ্যা পৃষ্ঠার ১০১-১০৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে, যেখানে আমি বলেছি, 'কিন্তু আমাদের এর কি কোন উত্তর দেওয়া উচিত নয় এবং সেই রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত নয়? কিন্তু সেই পন্থায় যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে শিখিয়েছেন। আর কাবুলের ভূমি থেকে যেভাবে আহমদীয়াতের চারাবৃক্ষ কেটে ফেলা হয়েছে, এখন খোদা তা'লা এর পরিবর্তে হাজার হাজার চারাবৃক্ষ রোপন করবেন। এর থেকে জানা যায় যে, সৈয়্যদ আব্দুল লতিফ সাহেব শহীদের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তাঁর হত্যাকারীকে হত্যা করা এবং তাদের রক্তপাত ঘটানো আমাদের লক্ষ্য নয়। কেননা হত্যা করা আমাদের কাজ নয়। খোদা তা'লা আমাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করার জন্য দাঁড় করিয়েছেন, নিজের শত্রুদের হত্যা করার জন্য নয়। অতএব, আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ হল তাদের এবং তাদের বংশধরদের হৃদয়ে আহমদীয়াতের বীজ বপন করা এবং তাদেরকে আহমদী বানানো আর যে জিনিসটাকে তারা মুছে ফেলতে চায় তা প্রতিষ্ঠিত করা। ..... কিন্তু এখন আমাদের কাজ হল তাঁর রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া এবং তাঁর হত্যাকারীরা যে জিনিসকে মুছে ফেলতে চায় তা প্রতিষ্ঠিত করা। যেহেতু খোদা তা'লার সম্মানিত জামাতের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা শত্রুদের উপকার সাধনের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে। তাই সৈয়্যদ আব্দুল লতিফ সাহেবের হত্যাকারীদেরকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা এবং হত্যা করাও আমাদের কাজ নয়। বরং আমাদের কাজ হল চিরকালের জন্য তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া, এক চিরন্তন জীবনের অধিকারী করে তোলা। আর এর পথ হল তাদেরকে আহমদী বানানো।"

প্রশ্ন: এই প্রেক্ষাপটে আহমদীয়াত বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: আহমদীয়াত বলতে বোঝানো হয়েছে ইসলামের সেই ব্যাখ্যা যা আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা নিজেই দিয়েছেন।

প্রশ্ন: এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে সব মৌলবীদেরকে মোল্লা নামে সম্বোধন করা হয়েছে, তারা কি এই মত প্রকাশ করেছিল যে, 'আহমদীরা মুরতাদ এবং হত্যাযোগ্য?'

উত্তর: আমি শুধু এতটুকু জানতে চাই যে, মৌলানা আবুল আলা মৌদুদী এই মত ব্যক্ত করেছিলেন।

প্রশ্ন: আপনার জামাত কি খাঁটি ধর্মীয় জামাত, না কি কিছুটা রাজনৈতিকও বটে?

উত্তর: প্রকৃতপক্ষে এটা ধর্মীয় জামাত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা একে এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দান করেছে যে, যখনই কোন রাজনৈতিক সমস্যা সামনে আসে তখন সে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন: আপনি যখন আপনার বক্তব্যে এই কথাগুলি বলছিলেন-

'স্মরণ রেখো, তবলীগ ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হতে পারে না, যতক্ষণ আমাদের ভিত্তি সুদৃঢ় না হয়। প্রথমে ভিত্তি মজবুত হলে তবলীগ হতে পারে।" - তখন এই কথাগুলি দ্বারা আপনি কি বোঝাতে চাইছিলেন?

উত্তর: কথাগুলি নিজের ব্যাখ্যা নিজেই করছে।

প্রশ্ন: ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার কিরূপ মনোভাব ছিল?

উত্তর: আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মানুষ যে দেশে থাকে সেই দেশের শর্তাবলী অনুসারে তার থাকা উচিত। যে কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। দেশের প্রতি তার বিশ্বস্ত থাকা উচিত।

প্রশ্ন: এটা কি বাস্তব যে ইংরেজরা বাগদাদ দখল করায় কাদিয়ানীরা আনন্দ উল্লাস করেছিল?

উত্তর: একথা সর্বৈব মিথ্যা।

প্রশ্ন: আপনি কি আপনার জামাতের সদস্যদের সব সময় একথা বলে এসেছেন যে, তাদের সমাজ অন্যান্য মুসলমানদের থেকে ভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়?

উত্তর: আজ্ঞে না।

প্রশ্ন: মুসায়লামা বিন আল হাবীব এর দাবি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

উত্তর: তার দাবি মিথ্যা ছিল।

প্রশ্ন: সে কি কলেমা পাঠ করত?

উত্তর: না।

প্রশ্ন: আপনি কি আসওয়াদ আনসি সাজাহ নাবিয়া কাযিবা এবং তুলাইহা আসাদি-র জীবনী পড়েছেন?

উত্তর: হ্যাঁ পড়েছি।

প্রশ্ন: উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের কি সকলেই নবুয়তের দাবি করেছিল, যাদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিল এবং যার পরিণামে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল?

উত্তর: না, বরং আসল ঘটনা এর সম্পূর্ন বিপরীত। এদের মধ্যে প্রত্যেকেই নবুয়তের দাবি করেছে এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছে।প্রত্যুত্তরে মুসলমানেরা আক্রমণ করে তাদের পরাস্ত করেছে।

প্রশ্ন: আপনি শরিয়তধারী এবং শরিয়ত বিহীন নবীর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। এখন দয়া করে ছায়া নবী বা প্রতিচ্ছায়া নবীর পরিভাষাও বলে দিন।

উত্তর: এই শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যার নিজস্ব কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য নেই, তার গুণাবলী হিসেবে যা কিছু প্রকাশ পায় তা আসল সত্তার গুণাবলীর প্রতিফলন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কি শরিয়তধারী নবী হওয়ার দাবি করেছিলেন?

উত্তর : না।

প্রশ্ন: মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব

কি সেই সব লোকদের মুরতাদ বলেছেন যারা আহমদী হওয়ার পর এই ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েছেন?

উত্তর: মুরতাদ শব্দের অর্থ এমন ব্যক্তি যে ফিরে যায়। মৌলানা মৌদুদী সাহেবও এই শব্দ ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন: আপনি কি মির্যা সাহেবকে ঐ সকল প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাকে মান্য করা মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেওয়ার জন্য জরুরী?

উত্তর: আমি এই প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের উপর ঈমান আনে না এমন কোন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেওয়া যায় না।

প্রশ্ন: আঁ হযরত (সা.)এর পর আরও কতজন সত্য নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন?

উত্তর: আমি কাউকে জানি না। কিন্তু যদি এই হিসেবে ধরা হয় যে, আমাদের রসুল করীম (সা.)-এর হাদীস অনুসারে উম্মতের উলেমাদের মধ্যেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার প্রতিফলন ঘটে , তবে এই সংখ্যা শত শত এমনকি হাজার হাজার হয়ে গেছে হয়তো।

প্রশ্ন: আপনি কি এই আকিদায় বিশ্বাসী যে, মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব আমাদের রসুল করীম (সা.) ছাড়া অন্যান্য সকল নবীর থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন?

উত্তর: তিনি কেবল হযরত মসীহ নাসেরী থেকে শ্রেয়তর ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস এতটুকুই।

প্রশ্ন: কিয়ামতের পূর্বে ঈসা ইবনে মরিয়ম (মসীহি নাসেরী)-এর পুনরাবির্ভাব ঘটবে। এটাই মুসলমানদের সর্ববাদিসম্মত ধর্মবিশ্বাস। এ সম্পর্কে আপনাদের কি আকিদা?

উত্তর: একথা ভুল যে এটা মুসলমানদের সর্ববাদিসম্মত আকিদা। মুসলমানদের একটা অংশ এমনও আছে যারা বিশ্বাস করে যে হযরত মসীহ নাসেরী স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছন। আমাদের ধর্মবিশ্বাস, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম স্বয়ং পুনরায় এই পৃথিবীতে আসবেন না। বরং অপর এক ব্যক্তি আসবেন যিনি তার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখবেন এবং তাঁর গুণে গুণান্বিত হয়ে আসবেন।

প্রশ্ন: হযরত ঈসা (আ.)এর যুগে ইহুদীরা কি কোনও মসীহর প্রতীক্ষায় ছিল?

উত্তর: হ্যাঁ অবশ্যই। তারা এক মসীহর আগমণের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু এর পূর্বে ইলিয়াস নবীর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল,যে কি না আকাশ থেকে সশরীরে নাযেল হওয়ার কথা ছিল।

প্রশ্ন: হযরত ঈসা-ই কি সেই মসীহ ছিলেন?

উত্তর: আমাদের আকিদা অনুসারে তিনিই মসীহ ছিলেন। কিন্তু ইহুদীদের আকিদা অনুসারে নয়।

প্রশ্ন: হযরত ঈসা নাসেরী কি কখনও নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করেছিলেন?

উত্তর:হ্যাঁ করেছিলেন।

প্রশ্ন: সাধারণ মুসলমানেরা আহমদীদের জানাযা এই কারণে পড়ে না যে তারা আহমদীদেরকে কাফের মনে করে। আপনি বলুন, আহমদীরা যে অ-আহমদীদের জানাযা পড়েনা, এটি ছাড়া আর কি কারণ আছে যা আপনি ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছেন? (অর্থাৎ অ-আহমদীরা যে আপনাদের জানাযা পড়ে না, এর প্রত্যুত্তর হিসেবে আপনারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন)

উত্তর: প্রধান কারণ, যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমরা অ-আহমদীদের জানাযা এই কারণে পড়ি না যে, তারা আহমদীদের জানাযা পড়ে না। .....আর দ্বিতীয় কারণ হল, যেটি আসলে প্রথম কারণেরই অনুষঙ্গ, একটি সর্ববাদিসম্মত ও সর্বজনস্বীকৃত হাদীস অনুসারে যে ব্যক্তি অপর মুসলমানকে কাফের বলে সে নিজেই কাফের।

প্রশ্ন: আপনি কি আপনার জামাত সম্পর্কে কখনও 'উম্মত' (জাতি) শব্দটি ব্যবহার করেছেন?

উত্তর: আমার আকিদা হল , আহমদীরা পৃথক কোন উম্মত নয়। যদি এখানে আহমদীদের সম্পর্কে উম্মত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তবে তা অসতর্কতার কারণে হয়ে থাকবে। এর অর্থ হবে জামাত।

প্রশ্ন: আল ফযল পত্রিকার ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগস্ট এর সংখ্যায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি ছাপা হয়েছে-

" আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উপর যে কাজ সোপর্দ করেছেন তা অন্য কোন উম্মতের সোপর্দ করেন নি। অতীতের আম্বিয়াদের মধ্যে কোন নবী এক লক্ষ (মানুষ)-এর প্রতি এসেছে, কোন নবী দুই লক্ষের প্রতি এসেছে আবার কেউ দশ লক্ষের প্রতি এসেছে। রসুল করীম (সা.) এর জাতি ছিল সওয়া লক্ষ কিম্বা হতে পারে তাঁর যুগে আরবের জনসংখ্যা দুই-তিন লক্ষ ছিল। এরাই ছিল তাঁর জাতি। কিন্তু আমাদের যাত্রা শুরু হতেই অনুগামীর সংখ্যা চল্লিশ কোটি। "

এখানে কোন অর্থে আপনি 'উম্মত' শব্দ ব্যবহার করেছেন?

উত্তর: এখানে আমি 'উম্মত' শব্দটি আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মতের জন্য ব্যবহার করেছি।

প্রশ্ন: আপনি কি ইংরেজদের প্রতি এজন্য কৃতজ্ঞ নন যে, তাদের যুগে আপনাদের বিশেষ ধর্মবিশ্বাস বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে? আর তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ না থাকাও কি আপনাদের জন্য সম্ভব?

উত্তর: কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা একটা নৈতিক কর্তব্য। এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। একথা সঠিক যে, আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আর এর কারণ হল তাদের ন্যায়বিচার ও পক্ষপাতহীন আচরণ যা তারা প্রত্যেকের প্রতি করেছে। আমরাও এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন: মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে ইসলামিক দেশগুলোতে প্রকাশনার জন্য এত সংখ্যক বই-পুস্তক রচনা করেছেন যার দ্বারা কমবেশি পঞ্চাশটি আলমারি পূর্ণ করা যাবে। একথা কি সত্যি নয়?

উত্তর: মির্যা সাহেব যা কিছু লিখেছেন তাতে তার উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য ধর্মের মানুষের মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব বিভ্রান্তি ছিল সেগুলো দূর করা। তাঁর রচনাবলী একাধিক বিষয়বস্তু সংবলিত ছিল, যেগুলো সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছিল। প্রসঙ্গক্রমে এর মাঝে জিহাদের প্রসঙ্গও চলে এসেছিল। কিন্তু এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে তিনি কেবল কয়েক পৃষ্ঠা সংবলিত একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন।

প্রশ্ন: নিম্নোক্ত পঙক্তিতে মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কি নিজেকে আঁ হযরত (সা.)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন নি?

له خسف القمر المنيروان
لی خسفا القمران المشرقان

অর্থাৎ রসুল আকরম (সা.)-এর জন্য কেবল চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু আমার জন্য সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সংঘটিত হয়েছে।

উত্তর: এই পঙক্তিটিতে কেবল সেই হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে, মাহদীর সময়ে রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য -উভয়কে গ্রহণ লাগবে।

প্রশ্ন: আপনি কি কখনও সাধারণ মুসলমানদেরকে আবু জাহল নামে সম্বোধন করেছেন আর নিজের জামাতকে সংখ্যা লঘু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন?

উত্তর: একথা সঠিক নয় যে আমি সাধারণ মুসলমানকে আবু জাহল এর দল নামে আখ্যায়িত করেছি। কিন্তু বাস্তব এটাই যে, সংখ্যার বিচারে আমাদের জামাত সংখ্যালঘু।

(সৌজন্যে: আল-ফজল, ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান- এ খিদমতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

২য় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলীঃ

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ উর্দ্ধ এবং অনুর্দ্ধ ২৫ হওয়া বাঞ্ছনীয়। (২) শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে উচ্চ-মাধ্যমিকে কমপক্ষে৪৫% নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।(৩) উর্দু/ ইংরেজি কমপোজিং এ পারদর্শী হতে হবে। টাইপিং এর গতি মিনিটে ৪৫ শব্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৪) এই ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে আবেদনগুলি আসবে সেগুলিই গণ্য করা হবে।

(৫) নিয়োগ কমিশনের পরীক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপ: (প্রতিটি বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

১ম ভাগ: (৩০ নম্বর) কুআন করীম নাজেরা (দেখাপড়া) এবং ১ম পারার অনুবাদ। * চালিশ জোয়াহের পারে, আরকানে ইসলাম, নামায (সম্পূর্ণ) অনুবাদ।

২য় ভাগ (২০ নম্বর) কিশতিয়ে নূহ, বারকাতুদ দোয়া, দ্বিনী মালুমাত* জামাত আহমদীয়ার আকিদাসমূহ সম্পর্কে প্রবন্ধ* দুররে সামীন থেকে নযম (শানে ইসলাম)।

৩য় ভাগ: (২০ নম্বর) উচ্চমাধিক স্তরের ইংরেজি।

৪র্থ ভাগ (২০ নম্বর) মাধ্যমিক স্তরের গণিত (অফিসের ইম্প্রেস্ট সম্পর্কি প্রশ্ন)

৫ম ভাগ (১০ নম্বর) সাধারণ জ্ঞান।

৬) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। (৭) লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৮) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৯) প্রত্যাশী প্রার্থী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। পরে থাকার বিষয়ে কোন প্রকারের আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।)

কবরে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া প্রসঙ্গে

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর একটি নির্দেশ এবং এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা

-হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এর (রা.)

সম্প্রতি নাযারাত ইসলাহ ও ইরশাদ রাবোয়ার পক্ষ থেকে আল ফজল ১২ই আগস্ট তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর কবরে ফুল সাজানোর বিষয় নিয়ে একটি ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছিল। এই ফতোয়া এমনিতে অসাধারণ, কিন্তু এতে কেবল একটি বিশেষ দিককে দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছিল। কেননা, প্রশ্নকারী কেবল একটি দিক দৃষ্টিপটে রেখে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, যে মৃতের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে কবরে ফুল দেওয়া বৈধ কি না? হযরত খলীফাতুল মসীহ এটিকে বেদাআত বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন আখ্যায়িত করে অবৈধ এবং খিলাফত বিরুদ্ধ বলে আখ্যা দেন। কিন্তু এই ফতোয়ার পরেও বিষয়টির এই দিকটি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে না হলেও এমনিতেও কি সৌন্দর্যায়নের উদ্দেশ্যে কবরে ফুল রাখা যায় না? এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.)-এর একটি নির্দেশ মনে পড়ে গেল যেখানে তিনি এই বিষয়টির উপরও আলোকপাত করেছেন। এর বিবরণ নিম্নরূপ:

১৯৩৮ সলে যখন (সম্ভবত এটা ৩৮ই সনই ছিল) লন্ডন থেকে মির্যা আযিজ আহমদ সাহেবের পুত্র আযিজ সাঈদ আহমদ মারহুম এর তাবুত এল আর তাঁকে শিশু কবরস্থানে দফন করার প্রক্রিয়া শুরু হল, সেই সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.) জানাযার সাথে কবরস্তানে এসেছিলেন। কবর প্রস্তুত হয়ে গেলে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি সৌন্দর্যায়ন এবং সম্মানের উদ্দেশে কবরে কিছু ফুল ছড়িয়ে দেওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.) তাকে বাধা দিয়ে বলেন (সম্ভবত এই ধরণেরই কিছু বলেছিলেন)

'এটা বৈধ নয়। এভাবে বিদাতের পথ উন্মোচিত হয়।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর উপরোক্ত ফতোয়ার সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.)-এর এই ফতোয়াটি মিলে একটি পরিপূর্ণ ফতেয়া তৈরী হয় যার মাধ্যমে এই বিষয় নিয়ে সমস্ত দিক পরিবেষ্টিত হয়েছে। যদিও কবরে ফুল দেওয়া আপাত দৃষ্টিতে একটি নিরীহ কাজ বলে মনে হয়, বরং বাহ্যিকভাবে এর দ্বারা মৃতের জন্য সম্মানও প্রদর্শিত হয়, কিন্তু গভীরভাবে দেখলে মানুষ বুঝতে পারবে যে, এতে দুই ধরণের কদাচার সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশাঙ্কা রয়েছে।

১) প্রথমত এইভাবে ক্রমশ শিরকের পথ উন্মুক্ত হয় এবং শুরুতে সাধারণত সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এর সূচনা হয়ে অবশেষে কবরের অসাধারণ সম্মান এমনকি কবর পুজো পর্যন্ত বিষয়টি গড়িয়ে যায়। যেমন, বর্তমান যুগের লক্ষ লক্ষ মুসলমান কবরে সিজদা করে নিজেদের পরকাল ধ্বংস করে ফেলে। অথচ যে সকল বুজুর্গদের কবরে তারা সিজদা করে, তারা কখনই এই সব পন্থার সমর্থক ছিলেন না আর তাঁরা জানতেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়। আমাদের প্রিয় রসুল (সা.) নেশাদ্রব্যের বিষয়ে কি অসাধারণ প্রজ্ঞাপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন-

مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهٗ فَقَلِيْلُهٗ حَرَامٌ

"অর্থাৎ যে বস্তু অধিক মাত্রায় মাদকতা সৃষ্টি করে তার সামান্য পরিমাণও হারাম বা অবৈধ।"

এই সূক্ষ্ম কথার অন্তর্নিহিত অর্থ, কোন বিষয়ের সূত্রপাত আপাত দৃষ্টিতে সামান্য ও সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন বলে মনে হয়। কিন্তু যেহেতু তার প্রভাব এবং পরিণাম ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে আর মানুষ যেহেতু এক দুর্বল সৃষ্টি এবং কোন ছোট্ট একটি বিষয়ের সূচনা করার পর সেই পথেই এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা তার মধ্যে রয়েছে, তাই শরিয়ত বিধান পরম প্রজ্ঞা দ্বারা আপাত নিরীহ অংশকেও গোঁড়া থেকেই উপড়ে ফেলেছে যাতে মানুষ হোঁচট খাওয়ার যাবতীয় সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পায়।এই কারণে আঁ হযরত (সা.) তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, 'দেখো, আমার মৃত্যুর পর আমার কবরকে যেন সিজদাস্থলে পরিণত করো না।" আঁ হযরত (সা.) জানতেন , তাঁর সাহাবাগণ কখনোই এমনটি করবে না, কিন্তু তিনি ভবিষ্যতের বিপদকে দেখছিলেন।

এই উক্তিতে আরও একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয় রয়েছে। যদি মৃত্যুবরণকারী খোদার কৃপায় পুণ্যবান ও জান্নাতী হয়ে থাকে তবে তার কবরে ফুল দেওয়া নেহাতই এক নিরর্থক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, যে আত্মা জান্নাতে পৌঁছে গিয়েছে আর জান্নাতের অতুলনীয় নেয়ামতরাজি লাভ করেছে কিম্বা সেই পথে বিচরণ করছে, তার জন্য পার্থিব জগতের ফুল কিই বা মূল্য রাখে? আর সে ফুল নিয়ে কিসের আনন্দ পাবে? বরং জান্নাতের ফুলের সামনে সেই ফুলকে নিজের জন্য অসম্মানকর বলে মনে করবে। অপরদিকে, খোদা না করুন, মৃত্যুবরণকারী যদি দোযখী হয় তবে সেই ফুল তার বিন্দুমাত্র উপকারে আসতে পারে না। বরং তার আত্মা (যদি জানতে পারে) মনে করবে আমার প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজন আমাকে নিয়ে উপহাস করছে। আমি দোজখের আগুনে পুড়ে মরছি আর তারা আমার উপর পুষ্প বর্ষণ করছে!!! তাই যে কোন দিক থেকেই দেখা হোক, কবরে ফুল দেওয়া এক প্রকার বিদআত যা কোন উপকারে আসে না। বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকর। কেননা, তা মৃতের জন্য কষ্টের কারণ, অপরদিকে এটা শিরক-এর পথও খুলে দিচ্ছে। এই কারণেই প্রাথমিক যুগে আঁ হযরত (সা.) এর সময় এবং এখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর যুগে কোন মোমেন কখনও এই ধরণের কথা বলে নি।

নিঃসন্দেহে ইসলাম আবশ্যিকভাবে কবরের সম্মান করার আদেশ দিয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কবরের উপর বসা এবং পা রাখা থেকে বিরত থাক এবং যথাসম্ভব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখ। সৌন্দর্যায়ন করা যায়, কিন্তু এটা আবশ্যিকভাবে সম্মান প্রদর্শনের সীমা পর্যন্ত, যাতে মৃতের অসম্মান না হয় আর তাদের আত্মীয়স্বজনদের আবেগ অনুভূতিও আহত না হয়। এর থেকে বেশি কিছু নয়। এর থেকে এগিয়ে যাওয়া বিদাতের অন্তর্ভুক্ত। এতে মৃতের কোন সম্মান হয় না, বরং, যেমনটি আমি পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি, প্রকৃতপক্ষে তাদের মনোপীড়ার কারণ হয়। আর এমন বিদাতের পরিণামও কখনও শুভ হয় না। মৃতের জন্য ক্ষমালাভ, তার পদমর্যাদা উন্নীত করা, সৎ উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য স্বর্গীয় প্রভুর সামনে যাচনা করা, তার সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্য খোদার নিকট দোয়া করা এবং নিজের মৃত্যুকে স্মরণ করে নিজের শুভ পরিণামের জন্য দীর্ঘ দোয়া করা- কবর যিয়ারতের এগুলোই উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কবর যিয়ারতের একটি উদ্দেশ্য রাজনীতিকও হয়ে থাকে। বিভিন্ন জাতি তাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশেষ বিশেষ নেতাদের কবরকে এমনভাবে তৈরী করে যাতে অন্যান্য জাতির মানুষ সেখানে এসে নিজেদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়ে সেখানে পুষ্পাঞ্জলি দেয়। আর মনে করা হয় যে, এই রীতি জাতিসমূহের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু স্পষ্টতই এই ধরণের যিয়ারতের প্রকৃত উদ্দেশ্য দোয়া থাকে না (বরং দর্শনাথীদের মধ্যে অনেক মানুষ এমনও থাকে যাদের দোয়ার প্রতি বিশ্বাস থাকে না।) তারা কেবল জাতিগত ও রাজনীতিকভাবে সম্মান এবং পারস্পরিক মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোকেই এর উদ্দেশ্য বলে মনে করে। এমতাবস্থায় জগতের রীতি হল যখন কোন বড় নেতা ভিন্ন কোন দেশে যায় তখন সেই দেশের প্রতিষ্ঠাতা বা অন্য বিশেষ কোন নেতার কবরে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেয় এবং চাদর চড়িয়ে আসে। এটা একটা রাজনীতিক সংস্কৃতি যার সঙ্গে এই ধর্মীয় ফতোয়ার কোন সম্পর্ক নেই। ওয়াল্লাহু আলামু।

জিহাদ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে আর একটা ভুল ধারণা এই যে, তারা জিহাদে অবিশ্বাসী। এই ধারণা ঠিক নয়। আহমদীগণ জিহাদের আবশ্যকতা স্বীকার করে। তাদের মতে যুদ্ধ দু' প্রকারের, পার্থিক যুদ্ধ ও ধর্ম যুদ্ধ বা জিহাদ। শত্রু যখন বাহুবলে ধর্ম নষ্ট করতে চেষ্টা করে, তরবারির ভয় দেখিয়ে ঈমান নষ্ট করতে উদ্যত হয়, ধর্ম রক্ষার জন্য তখন যে যুদ্ধ করা হয় তাই জিহাদ বা ধর্ম যুদ্ধ। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হলে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। তবে জিহাদের একটি অপরিহার্য শর্ত আছে। জিহাদ করতে হলে প্রথমেই ইমাম বা নেতা আবশ্যক; এবং নেতার পক্ষ থেকে জিহাদের ঘোষণা হওয়া আবশ্যক; নেতা যাকে প্রথমে যুদ্ধে আসতে আহ্বান করবেন, প্রথমে তারই আসা আবশ্যক, এবং অবশিষ্ট মুসলমানের আসার জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। ইমাম যাদেরকে জিহাদের আহ্বান জন্য আহ্বান করে, না আসলে শুধু তারাই আল্লাহ্ কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। অবশিষ্ট মুসলমান অপরাধী হবে না। ইমাম না থাকলে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের ব্যক্তিগত ফরয হয়ে দাঁড়ায় এবং জিহাদ না করলে প্রত্যেক মুসলমানই আল্লাহ্র কাছে অপরাধী হয়।

আহমদীদের ধারণা এই যে, ইংরেজ অস্ত্রবলে ধর্ম নষ্ট করতে চেষ্টা করে নি। এ কারণে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ সমর্থন করে নি। আহমদীদের এই ধারণাকে যে সকল আলেম ভুল মনে করেন, তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন কি? ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ফরয হয়ে থাকলে আহমদীগণ তো আল্লাহ্র কাছে এ জবাব দিবে যে, আমরা বুঝতে ভুল করেছিলাম; জিহাদ আবশ্যক মনে করি নি বলে আমরা জিহাদ করি নি। কিন্তু যে সকল আলেম ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয মনে করেন, অথচ জিহাদ করেন নি, আল্লাহ্র কাছে তাঁরা কি জবাব দিবেন? তাঁরা কি একথা বলবেন যে, হে আল্লাহ! জিহাদের সময় তো এসেছিল; জিহাদ করাকে ফরযও মনে করেছিলাম, কিন্তু জিহাদ করার মত সাহস আমাদের ছিল না। যাদের সাহস ছিল তাদেরকেও জিহাদ করার জন্য বলতে সাহস পাই নি। আমাদের ভয় হত যে, জিহাদের কথা বললে ইংরেজ আমাদেরকে জেলে দিবে। এ দু' উত্তরের মধ্যে কোন্ উত্তর আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? (আহমদীয়াতের পয়গাম, পৃ: ১৬-১৭)

জুমআর খুতবা

যুদ্ধে তাকে সর্বাধিক সাহসী মনে করা হতো যে মহানবী (সা.)-এর পাশে থাকত, কেননা তিনি (সা.) অনেক ভয়াবহ স্থানে থাকতেন। সুবহানাল্লাহ্! কতই-না অতুলনীয় মর্যাদা।

উহুদের দিন মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলের কাছ থেকে মৃত্যুর শর্তে বয়আত নিয়েছেন। বাহ্যত যখন মুসলমানরা পিছু হটে তখনও তারা অবিচল ছিলেন এবং নিজেদের জীবন বাজি রেখে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তাদের মধ্য হতে কয়েকজন শহীদ হয়ে যান।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন যে, কাফিররা যখন মহানবী (সা.)-কে ঘিরে ফেলে তখন মহানবী (সা.) বলেন, মান রাজুলুন ইয়াশরী লানা নাফসাহ্। অর্থাৎ, কে আছে যে আমাদের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেবে? তখন যিয়াদ বিন সাকান পাঁচজন আনসারী সাহাবীর সাথে দণ্ডায়মান হন; কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন আম্মারা বিন ইয়াযিদ বিন সাকান (রা.)।

আহত যিয়াদকে আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে তুলে নিয়ে আসা হয়। তিনি নিজের মুখমণ্ডল মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চরণে সমর্পণ করেন এবং এই অবস্থাতেই প্রাণ ত্যাগ করেন।

যে-সব সাহাবী মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে সমবেত ছিলেন, তারা যে আত্মনিবেদন প্রদর্শন করেছেন-ইতিহাস এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অপারগ। তাঁরা পতঙ্গের মতো মহানবী (সা.)-এর চতুষ্পার্শ্বে ঘুরছিলেন আর তাঁর খাতিরে নিজেদের জীবন বাজি রেখে (প্রাণপণ) লড়াই করছিলেন। যে আঘাতই আসত, সাহাবীরা তা বুক পেতে নিতেন এবং মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা করতেন আর একই সঙ্গে শত্রুদের ওপরও আক্রমণ রচনা করতেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ই পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষ বিবেচিত হন।

ফিলিস্তীনের অত্যাচারিতদের জন্য এবং বিশ্বযুদ্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান। ইসরাঈল এখন লেবানন সীমান্তেও হিযবুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করতে যাচ্ছে এবং এর ফলে অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে। অনুরূপভাবে আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যের ইয়েমেনের হুথি গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে- এ বিষয়গুলো যুদ্ধকে আরো বিস্তৃত করছে। এখন অনেক লেখক এটিও লিখছে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আভাস আরো সন্নিকট মনে হচ্ছে। কাজেই, অনেক দোয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১২ই জানুয়ারী,, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১২ সুলাহ, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: উহুদের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনী ও চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ হলো, মানুষের মধ্য হতে মহানবী (সা.) শত্রুর সবচেয়ে বেশি নিকটে ছিলেন আর তাঁর সাথে পনেরোজন (সাহাবী) অবিচল থাকেন। মুহাজিরদের মধ্য হতে যে আটজন ছিলেন (তারা হলেন,) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত তালহা (রা.), যুবায়ের (রা.), আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) এবং আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ (রা.)। আর আনসারের সাতজন হলেন, হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.), আবু দুজানা (রা.), আসেম বিন সাবেত (রা.), হারেস বিন সিম্মা (রা.), সাহ্‌ল বিন হুনায়েফ (রা.) এবং সা'দ বিন মুআয (রা.)। কারো কারো মতে, সা'দ বিন উবাদা (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর সামনে ত্রিশজন (সাহাবী) অবিচল ছিলেন আর সবাই এ কথাই বলছিলেন যে, আমার মুখমণ্ডল যেন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখকাফির মণ্ডলের সামনে থাকে এবং আমার প্রাণ তাঁর জীবন রক্ষায় নিবেদিত।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৬)

তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক আর আমার প্রাণ তাঁর জন্য উৎসর্গিত হোক।

একটি রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.)-এর সাথে এগারোজন (সাহাবী) এবং তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ রয়ে গিয়েছিলেন। আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, মুশরিকরা যখন মহানবী (সা.)-কে ঘিরে ফেলে তখন তিনি (সা.) সাতজন আনসারী সাহাবী এবং একজন কুরাইশ সাহাবীর মাঝখানে ছিলেন। অনুরূপভাবে আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মহানবী (সা.) নয়জন সাহাবীর মাঝে একাই ছিলেন। (এদের মধ্যে) সাতজন আনসার এবং দুজন কুরাইশের মধ্য হতে, আর মহানবী (সা.) ছিলেন দশম।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০২-২০৩)

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.)-এর সাথে যে-সব সাহাবী অবিচল ছিলেন তাদের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করা হয়েছে। (আমাদের) রিসার্চ সেল এক্ষেত্রে নিজেদের যে নোট দিয়েছে তাতে তারা বলেছে, ত্রিশজনের যে উল্লেখ পাওয়া যায় এর একটি ব্যাখ্যা এটিও হতে পারে যে, সে সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবীদের সংখ্যা (হয়ত) পরিবর্তন হতে থাকে। যিনি পনেরোজন দেখেছেন তিনি পনেরোজন বলেছেন, যিনি যতজন দেখেছেন তিনি তাই বর্ণনা করেছেন। সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসা-যাওয়া করে থাকবেন, যে কারণে সংখ্যায় তারতম্য দেখা দিয়েছে।

যাহোক, এটিই সঠিক বলে মনে হয়। কেননা, এটি পূর্বেই সাম্প্রতিক বিভিন্ন খুতবায় বর্ণিত হয়েছে যে ,সাহাবীরা তাঁর পাশে একত্রিত হতেন; এরপর শত্রুর আক্রমণে নিরাপত্তা বলয় ভেঙ্গে যেতো, পুনরায় সমবেত হতেন।

আসল কথা হলো, সাহাবীরা অবিচলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কারো মাঝে মৃত্যুর ভয় ছিল না। এটিও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, উহুদের দিন মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলের কাছ থেকে মৃত্যুর শর্তে বয়আত নিয়েছেন। বাহ্যত যখন মুসলমানরা পিছু হটে তখনও তারা অবিচল ছিলেন এবং নিজেদের জীবন বাজি রেখে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তাদের মধ্য হতে কয়েকজন শহীদ হয়ে যান।

সেদিন আটজন তাঁর পবিত্র হাতে মৃত্যুর শর্তে বয়আত করেন। এই বয়আতকারী সৌভাগ্যবানদের মধ্যে যে-সব নাম রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো হলো, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.),

হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়র (রা.), হযরত সা'দ (রা.), হযরত সাহ্‌ল বিন হুনায়েফ (রা.), হযরত আবু দুজানা (রা.), হযরত হারেস বিন সিম্মা (রা.), হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.), হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.)। তাঁদের মধ্য হতে কেউই শহীদ হন নি।

(আসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩১) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৮)

আল্লামা যামাখশারীর গ্রন্থ 'খাসায়েসে আশারা'তে উল্লিখিত আছে, উহুদের দিন হযরত যুবায়ের (রা.) পরম অবিচলতার সাথে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গা দিয়েছেন এবং তিনি সেই সময় মহানবী (সা.)-এর হাতে মৃত্যুর শর্তে বয়আত করেছিলেন। অর্থাৎ এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিবেন, তবুও তাঁর (সা.)-এর সঙ্গা পরিত্যাগ করবেন না।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩২১)

সীরাত খাতামান্ নবীঈন গ্রন্থে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) সাহাবীদের অবিচলতা এবং আত্মনিবেদন সম্পর্কে লিখেছেন: "যে-সব সাহাবী মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে সমবেত ছিলেন, তারা যে আত্মনিবেদন প্রদর্শন করেছেন-ইতিহাস এর দৃষ্টান্ত উপস্থ াপনে অপারগ। তাঁরা পতঙ্গের মতো মহানবী (সা.)-এর চতুষ্পার্শ্বে ঘুরছিলেন আর তাঁর খাতিরে নিজেদের জীবন বাজি রেখে (প্রাণপণ) লড়াই করছিলেন। যে আঘাতই আসত, সাহাবীরা তা বুক পেতে নিতেন এবং মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা করতেন আর একই সঙ্গে শত্রুদের ওপরও আক্রমণ রচনা করতেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯৫)

তিনি (রা.) আরও লিখেন,এই গুটিকতক আত্মনিবেদিত (সাহাবী) সেই প্রবল বানের সামনে কতক্ষণ আর টিকতে পারতেন, যা প্রতিটি মুহূর্তে সর্বগ্রাসী তরঙ্গের ন্যায় চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসছিল! শত্রুর প্রতিটি আক্রমণের ঢেউ মুসলমানদেরকে কোথা হতে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত, কিন্তু আক্রমণের প্রকোপ কিছুটা প্রশমিত হতেই অসহায় মুসলমানরা লড়াই করতে করতে আবার নিজেদের প্রিয় মনিবের চতুষ্পার্শ্বে জড়ো হয়ে যেতেন। কখনও কখনও এমন ভয়াবহ আক্রমণ হতো যে, মহানবী (সা.) বাহ্যত একেবারেই নিঃসঙ্গা হয়ে পড়তেন। যেমন এমন এক সময় আসে যখন মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে কেবলমাত্র ১২জন সাহাবী অবশিষ্ট থাকেন, আর এমনও একটি সময় আসে যখন তাঁর চতুষ্পার্শ্বে কেবল দুজন সাহাবী-ই রয়ে গিয়েছিলেন। সেই আত্মনিবেদিতদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়র (রা.), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত আবু দুজানা আনসারী (রা.), হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.) এবং হযরত তালহা আনসারী (রা.)র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ আছে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৯৫-৪৯৬)

এই উদ্ধৃতি থেকে মহানবী (সা.)-এর চতুষ্পার্শ্বে (উপস্থিত) সাহাবীদের সংখ্যার যে তারতম্য বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যেমনটি আমি বলেছিলাম, আক্রমণের কারণে কখনও সংখ্যা কমে যেত আবার কখনও বৃদ্ধি পেতো।

মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের একটি অপবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খ্রিষ্টানরা অপবাদ দিয়েছে যে, মহানবী (সা.) নাকি মিথ্যা বলা বা ভিত্তিহীন কথা বলা বৈধ আখ্যায়িত করেছেন। তিনি (আ.) বলেন,

"আমাদের নেতা ও মনিব, পবিত্র নবী (সা.)-এর শিক্ষার এক অনন্য দৃষ্টান্ত এই স্থানে সাব্যস্ত হয় আর তা হলো, যেই তওরিয়াকে (বা দ্ব্যর্থ বোধক কথাকে) আপনাদের ঈসা (আ.) মাতৃদুগ্ধের ন্যায় সারা জীবন ব্যবহার করেছেন, মহানবী (সা.) যতদূর সম্ভব এথেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।" তওরিয়া'র আভিধানিক অর্থ হলো, মুখে কিছু বলা আর আর হৃদয়ে অন্য কিছু পোষণ করা। অর্থাৎ এমন কথা বলা যার দুটি অর্থ হতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তওরিয়া শব্দটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আভিধানিক অর্থ আমি বলে দিয়েছি। এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, অস্বাভাবিক পরিস্থি তিতে ভয়ের কারণে কোনো বিষয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো কারণে একটি বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে এমন সব রূপক ও উপমার মাধ্যমে কথা বর্ণনা করা যেন বুদ্ধিমান লোকেরা সেসব কথা বুঝতে সক্ষম হলেও নির্বোধরা তা বুঝতে না পারে। অর্থাৎ প্র জ্ঞার সাথে এমনভাবে কথা বলা যা মিথ্যাও হবে না এবং বুদ্ধিমান আসল বাস্তবতা কী তা বুঝতে সক্ষম হয়, কিন্তু নির্বোধ ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে; তার ধারণা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। তিনি বলেন, কিন্তু এটি উন্নত মানের তাকওয়ার পরিপন্থী। হাদীস থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, এটি উন্নত পর্যায়ের তাকওয়ার পরিপন্থী। অতএব মহানবী (সা.)-এর ক্ষেত্রে এটি কখনো প্রমাণ করা সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে যা বলেন তার সারাংশ হলো, খ্রিষ্টানদের ভাষ্য অনুযায়ী যে ব্যক্তিকে তারা খোদা মানে- তার অবস্থা হলো, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে তিনি মিথ্যা বলেছেন।

যাইহোক এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে তিনি (আ.) বলেন,

"মহানবী (সা.) যথাসম্ভব এর থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন কথার অর্থ বাহ্যিকভাবেও মিথ্যা সদৃশ না হয়। কিন্তু কী বলব আর কীই-বা লিখব! আপনাদের ঈসা সাহেব সত্যের ক্ষেত্রে এতটা সাবধানতা অবলম্বন করতে পারেন নি। যে ব্যক্তি খোদা হওয়ার দাবি করে তার তো সিংহের ন্যায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়া উচিত ছিল; সারা জীবন তওরিয়া অবলম্বন করে, মিথ্যা-সদৃশ সব কথা বলে এটি প্রমাণ করার কথা না যে, সে সেসব পরিপূর্ণ মানবদের অন্তর্ভুক্ত নয় যারা মৃত্যুর বিষয়ে ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে শত্রুদের মোকাবিলায় নিজেকে প্রকাশ করে এবং খোদা তা'লার ওপর নির্ভর করে। আর কোনো স্থানে (তারা) ভীরুতা প্রদর্শন করে না। অর্থাৎ যে আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করে- সে এবং খোদার নবীরা কখনও ভীরুতা প্রদর্শন করেন না। এসব কথা স্মরণ করে আমার কান্না পায় যে, যদি কেউ এমন স্বল্প বুদ্ধির ঈসার এই দুর্বল অবস্থা এবং তওরিয়ার প্রতি, যা এক প্রকার মিথ্যা, আপত্তি করে- তাহলে আমরা এর কী উত্তর দেবো? আমি যখন দেখি, সৈয়্যদুল মুরসালীন (সা.) উহুদের যুদ্ধে একাকী অবস্থায় উন্মুক্ত তরবারির সামনে বলছিলেন যে, আমি মুহাম্মদ, আমি আল্লাহ্‌র নবী, আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। অপরদিকে আমি দেখি যে, আপনাদের ঈসা কম্পমান অবস্থায় নিজের অনুসারীদের এই মিথ্যা কথা শিখাচ্ছেন, কাউকে বলো না যে, আমিই ঈসা মসীহ্; অথচ এই কথা বললে কেউ তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় না- আমার আশ্চর্যের কোনো সীমা থাকে না যে, হে আল্লাহ্! এই ব্যক্তিও কি নবী হতে পারে, খোদার পথে যার বীরত্বের অবস্থা এমন?

(নুরুল কুরআন নম্বর-২, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪০৫-৪০৭) (দায়েরায়ে মারেফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭৩৭)

হযরত ঈসার ক্ষেত্রে এই আশ্চর্যের বহিঃপ্রকাশ আসলে খ্রিষ্টানদের অভিযুক্ত করার আদলে তিনি উত্তর দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস এটি ছিল না যে, হযরত ঈসা নবী নন। তাঁর কথার অর্থ এটি ছিল না যে, হযরত ঈসা নবী নন। বরং তিনি বলেন, যে নবীকে তোমরা উপস্থাপন করো আর যাকে খোদার পুত্র আখ্যায়িত করো -তোমাদের পুস্তক অনুসারে এই হলো তার অবস্থা। তথাপি তোমরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আপত্তি করো যে, তিনি মিথ্যা বলা বা ভীরুতা প্রদর্শন করা বৈধ আখ্যা দিয়েছেন!

ইবনে ইসহাক লিখেছেন যে, কাফিররা যখন মহানবী (সা.)-কে ঘিরে ফেলে তখন মহানবী (সা.) বলেন, মান রাজুলুন ইয়াশরী লানা নাফসাহ্। অর্থাৎ, কে আছে যে আমাদের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেবে? তখন যিয়াদ বিন সাকান পাঁচজন আনসারী সাহাবীর সাথে দণ্ডায়মান হন; কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন আম্মারা বিন ইয়াযিদ বিন সাকান (রা.)।

তারা মহানবী (সা.)-এর সামনে বীরত্বের স্বাক্ষর রেখে একে একে শহীদ হতে থাকেন। এমনকি তাদের মধ্য থেকে শেষ ব্যক্তি ছিলেন যিয়াদ অথবা আম্মারা (রা.)। তারা লড়াই করতে থাকেন এমনকি তাদের শরীরে অনেক আঘাত লাগে। অতঃপর মুসলমানদের একটি দল ফিরে আসে আর মুশরিকদের মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, যিয়াদ বিন সাকানকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে যখন আনা হয় তখন তিনি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, তাকে আমার আরও নিকটবর্তী করো। তখন সাহাবীগণ তাকে মহানবী (সা.)-এর নিকটবর্তী করে দেন। তিনি (সা.) নিজের পবিত্র চরণ তার নিকটবর্তী করেন। তিনি (রা.) নিজের চেহারা মহানবী (সা.) পবিত্র চরণে রেখে দেন। হযরত যিয়াদ (রা.)-র মৃত্যু এমন অবস্থায় হয়েছিল যখন তাঁর গাল মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চরণে ছিল আর তার দেহে চৌদ্দটি আঘাত লেগেছিল। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২০৩)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, একটা সময় যখন কুরাইশের আক্রমণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তখন মহানবী (সা.) বলেন, কে আছে যে এই সময় আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের জীবন উৎসর্গ করবে? এক আনসারীর কানে যখন এই আওয়াজ পৌঁছে তখন তিনি এবং আরও ছয়জন আনসারী সাহাবী উন্মাদের ন্যায় এগিয়ে আসেন এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তাঁর (সা.) আশেপাশে লড়াই করতে করতে জীবন বিলিয়ে দেন। যিয়াদ বিন সাকান (রা.) এই দলের প্রধান ছিলেন। যখন কাফিরদের এই আক্রমণ কিছুটা প্রশমিত হয় এবং অন্য সাহাবীরা চলে আসেন আর উক্ত স্থানও কিছুটা পরিষ্কার হয় তখন মহানবী (সা.) নির্দেশ দেন যে, যিয়াদকে তুলে আমার কাছে নিয়ে এসো, তিনি আহত অবস্থায় পড়েছিলেন। লোকেরা তাকে তুলে নিয়ে আসে আর মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে উপস্থিত করে। সেই সময় যিয়াদ-এর মাঝে প্রাণের স্পন্দন কিছুটা বাকি ছিল, কিন্তু তিনি অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগের দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। এমন অবস্থায় তিনি (রা.) অনেক

চেষ্টা করে তার মাথা তুলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চরণে সমর্পণ করেন এবং এই অবস্থাতেই প্রাণ ত্যাগ করেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ:-৪৯৬)

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-র শাহাদতের ঘটনায় লিখিত আছে যে, হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে লড়ছিলেন এবং লড়াই করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। তাঁকে (রা.) ইবনে কামিয়া শহীদ করে। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৫২৯)

ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের পতাকাবাহক হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) পতাকা রক্ষার দায়িত্ব অতি উত্তমরূপে পালন করেন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মুসআব (রা.) পতাকা বহন করছিলেন আর ইবনে কামিয়া, যে অশ্বারোহী অবস্থায় ছিল, হযরত মুসআব (রা.)-র ডান হাতে তরবারি দ্বারা আঘাত করে এবং তা কেটে ফেলে যা দ্বারা তিনি পতাকা ধরে রেখেছিলেন। এতে তিনি (রা.) বাম হাত দিয়ে পতাকাটি ধরে ফেলেন। ইবনে কামিয়া তখন বাম হাতে আঘাত করে সেটিও কেটে ফেলে। তখন তিনি (রা.) উভয় বাহু দ্বারা ইসলামী পতাকাকে নিজের বুকের সাথে চেপে ধরেন। এরপর ইবনে কামিয়া তৃতীয়বার বর্শা দিয়ে আক্রমণ করে আর হযরত মুসআব-এর বুকে তা বিদ্ধ করে। বর্শা ভেঙে যায় ও হযরত মুসআব মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তখন বনু আব্দুদ্ দার গোত্রের দুই ব্যক্তি সুয়াইবাত বিন সা'দ বিন হারমালা এবং আবু রোম বিন উমায়ের অগ্রসর হন; আবু রোম বিন উমায়ের পতাকাটি ধরে ফেলেন এবং মুসলমানদের ফিরে আসা ও মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তা তাঁর হাতেই ছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৯)

এটি এক ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী এরপর মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-র হাতে পতাকা দিয়েছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশ সেনারা প্রায় চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল এবং মুহুর্মুহু আক্রমণ রচনা করে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা হয়ত কিছু সময় পর নিজেদের সামলে নিতে পারত, কিন্তু নিষ্ঠুর ঘটনা যা ঘটে তা হলো, কুরাইশের এক নির্ভীক সৈনিক আবদুল্লাহ্ বিন কামিয়া মুসলমানদের পতাকাবাহক মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-র ওপর আক্রমণ করে এবং নিজের তরবারির আঘাতে তার (রা.) ডান হাত কেটে ফেলে। মুসআব (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে অন্য হাতে পতাকা নিয়ে নেন আর ইবনে কামিয়ার মোকাবিলার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হন, কিন্তু সে দ্বিতীয় আঘাতে তার (রা.) অপর হাতও কেটে ফেলে। তখন মুসআব (রা.) নিজের দুই কাটা হাত একত্রিত করে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে ইসলামী পতাকা সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেন। এরপর ইবনে কামিয়া তৃতীয় আক্রমণ করে আর এবার মুসআব (রা.) শহীদ হয়ে পড়ে যান। পতাকা তো তৎক্ষণাৎ অন্য কোনো মুসলমান এগিয়ে এসে ধরে ফেলেন, কিন্তু যেহেতু মুসআব (রা.)-র দেহের আকৃতি ও গঠনগড়ন মহানবী (সা.)-এর মতো ছিল তাই ইবনে কামিয়া ধরে নিয়েছিল যে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। আবার এটাও হতে পারে, সে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ও ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কৌশল অবলম্বন করেছিল। যাহোক, মুসআব (রা.) শহীদ হয়ে পড়ে গেলে সে হৈ চৈ আরম্ভ করে দেয়, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। এই সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট মনোবলও হারিয়ে যায় এবং তাদের জমায়েত একেবারে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৯৩)

যেভাবে এখনই বর্ণনা করা হলো, উহুদের প্রান্তরে অল্প কিছু সময়ের অসতর্কতায় ইসলামী সেনাবাহিনীর বিজয় সাময়িক পরাজয়ে বদলে যায়। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ই পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষ বিবেচিত হন।

তিনি (সা.) যুদ্ধের পরিবর্তিত পরিস্থিতির ওপর গভীর দৃষ্টি রাখেন। চারগুণ বড়ো সেনাবাহিনীর সামনে নিজের বিক্ষিপ্ত ও দুর্বল সেনাবাহিনীকে এভাবে নিরাপদ করেন যে, শত্রুপক্ষ ইসলামী সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অশুভ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারে নি। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-র শাহাদতের পর মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাবাহিনীর পতাকা হযরত আলী (রা.)-কে প্রদান করেন। তিনি (রা.) ইসলামী সেনাবাহিনীর পতাকা হাতে নিয়ে বিজয়ের নেশায় উন্মাদ শত্রুদের সামনে দাঁড়িয়ে যান। তার (রা.) তরবারি আঘাতের পর আঘাত করছিল, বিক্ষিপ্ত ইসলামী সেনাবাহিনীর আত্মবিশ্বাস পুনর্বহাল করছিল। হযরত আলী (রা.) রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর পাশে সমবেত গুটিকয়েক ব্যক্তির সমন্ব য়ে গঠিত ইসলামী সেনাবাহিনীর ছোট্ট জামাতের সাথে একত্রিত হয়ে এমন যুদ্ধ করেন যে, মুশরিকদের ঘেরাও থেকে বের হওয়ার পথ তৈরি হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নেতৃত্বে এই ছোট্ট দলটি পথ তৈরি করে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত বিক্ষিপ্ত ইসলামী সেনাদলের দিকে অগ্রসর হয়, যারা রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ শুনে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বসছিল। এজন্য মক্কার মুশরিকরাও ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রত্যাবর্তনকে বিফল করার জন্য প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে দেয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পেছনে সরে আসার প্রজ্ঞাপূর্ণ পদক্ষেপও এতই সফল ছিল যে, গুটিকয়েক সদস্যের দলটি অর্ধবৃত্তাকারে কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুদের আক্রমণকে বিফল করে অলক্ষ্যে গিরিপথের দিকে সরে আসছিল। শত্রুরা পরিবেষ্টনের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে, কিন্তু তিনি (সা.) এই আক্রমণকারীদের ভিড় কেটে পথ তৈরি করেই নেন।

(গাযওয়াত ও সারায়া, পৃ: ১৯৯-২০১)

উহুদের যুদ্ধের সময় নিদ্রা ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার উল্লেখও পাওয়া যায়। সাহাবীরা যারা লড়ছিলেন তাদের ওপর ঘুমের অবস্থা ছেয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা এমন কোনো অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যার ফলে তাদের তন্দ্রা পেয়ে বসে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো-

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) বর্ণনা করেন, যখন উহুদের যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন হলো তখন আমি দেখলাম, আমি রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে রয়েছি।

তখন আমরা সবাই হতবিহ্বল ও ভীত ছিলাম আর আমাদের ওপর তন্দ্রা নেমে আসে। এমন অবস্থা ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন আমাদের ওপর তন্দ্রাভাব চাপানো হয়েছে। আমাদের মাঝে একজনও এমন ছিল না যার চিবুক তার বুকের সাথে লেগে যায় নি। অর্থাৎ ঘুম এবং তন্দ্রার অবস্থায় মাথা নীচের দিকে নুইয়ে পড়েছিল।

তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার এমন মনে হচ্ছিল,আমি যেন স্বপ্নে মুআত্তেব বিন কুশায়ের (রা.)-র আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। তিনি বলছিলেন, যদি আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকত তাহলে আমরা কখনো এখানে এভাবে নিহত হতাম না। মুআত্তেব বিন কুশায়ের (রা.) আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি আকাবার বয়আত, বদরের যুদ্ধ ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমি তার এই বাক্যটি মুখস্থ করে নিলাম। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন,

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ

অর্থ: অতঃপর, তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের প্রতি দুঃখের পর প্রশান্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে তন্দ্রা অবতীর্ণ করেছিলেন যা তোমাদের এক দলকে আচ্ছাদিত করছিল। আর এক দল এমনও ছিল যাদের জীবন তাদের চিন্তিত করে রেখে ছিল, তারা আল্লাহ্‌র সম্পর্কে অজ্ঞতার যুগের ধারণা মতো অন্যায় ধারণা করছিল। তারা বলছিল, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কি আমাদের-ও কোনো ভূমিকা আছে? তুমি ঘোষণা করে দাও, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নিশ্চিতভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার। (আলে ইমরান: ১৫৫)

হযরত কা'ব বিন আমর আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন এক পর্যায়ে আমি আমার জাতির চৌদ্দোজনের সাথে মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় আমরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাই যা প্রশান্তিস্বরূপ ছিল, অর্থাৎ অত্যন্ত প্রশান্তিপূর্ণ তন্দ্রা ছিল। যুদ্ধাবস্থ াতেও সেই তন্দ্রা আমাদেরকে স্বস্তি প্রদান করছিল। এমন একজন ব্যক্তিও ছিল না যার বুক থেকে হাপরের মতো নাক ডাকার শব্দ বের হচ্ছিলো না। তিনি বলেন, আমি বিশর বিন বারা বিন মা'রুরের (রা.) হাত থেকে তরবারি খসে পড়ে যেতে দেখেছি। অথচ তিনি তরবারি পড়ে যাওয়ার বিষয়টি অনুভবই করতে পারেন নি; অথচ মুশরিকরা আমাদের দিকে ধেয়ে আসছিল।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১০) (উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাবে.) এই আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন, হতে পারে তরবারি পড়ে যাওয়ার বিষয়টি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সেই সময় ঘুম তো ছিল, কিন্তু তার হাতে যে অস্ত্র ছিল তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা ছিল। তা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে ঝাঁকুনি লাগতো। যা-ই হোক, এখানে 'নআস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর তফসীর হচ্ছে, বিভিন্ন আঙ্গিকে اَمَنَةً نُّعَاسًا এর যে-সব অর্থ দাঁড়ায় সেসবের সার কথা হলো, কষ্টের পর তোমাদের প্রতি এমন প্রশান্তি অবতীর্ণ করা হয়েছে যাকে ঘুম বলা যেতে পারে। অথবা এমন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেছেন যা প্রশান্তিদায়ক ছিল। অথবা এমন শান্তি প্রদান করা হয়েছে যা ঘুমের মতো প্রভাব রাখত, অথবা ঘুমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই اَمَنَةً نُّعَاسًا এর অর্থ হলো, তন্দ্রা- সাময়িকভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে ধাক্কা খাওয়াকেও বলে। কিন্তু 'নুআস'-এর অর্থ তেমন তন্দ্রা নয়, বরং ঘুম ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থা হয়ে থাকে। ঘুমানোর আগে মধ্যবর্তী এমন একটি অবস্থা তৈরি হয় যখন শরীরের সকল স্নায়ু এক প্রকার প্রশান্তি বোধ করে; সেটিই এক গভীর প্রশান্তি।

সেই প্রশান্তিকর অবস্থা যদি চলমান থাকে তবে তা পরে নিদ্রায় রূপান্তরিত হয়। আর তন্দ্রার অবস্থায় যদি মানুষ হাঁটতে থাকে তাহলে মানুষ পড়বে না, ঠিক পড়ার উপক্রম হলে তার ঝাঁকুনি লাগবে; সে বুঝতে পারে, আমি কী অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু যদি ঘুমিয়ে যায় তবে তার স্নায়ু এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যাহোক, হতে পারে সেই সময়ে বিশর বিন বারা (রা.)-র এমন অবস্থায় গভীর ঘুমও পেয়ে থাকবে। কিন্তু যুদ্ধাবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সেই অবস্থাটি ছিল প্রশান্তিকর। এমন অবস্থায় মানুষ পড়ে যায়। যদি এটিকে সঠিকও ধরে নেওয়া হয় তবে সেই কারণেই হয়ত তার হাত সামান্য ঢিলে হয়ে তরবারি পড়ে যায়। যাহোক, এটি এমন একটি অবস্থা যাতে তৎক্ষণাৎ বোঝাও যায় যে, আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হচ্ছি; তখন মানুষ ঝটকা লেগে জেগে ওঠে। সুতরাং, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন প্রশান্তি কর অবস্থায় উপনীত করেছি যা ঘুমের সদৃশ ছিল। কিন্তু ঘুমের মতো এতোটা গভীর ছিল না যে তোমাদের নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকবে না। সেটি প্রশান্তি তো দিচ্ছিল কিন্তু তোমাদেরকে অকর্মণ্য করছিল না।

অনুরূপভাবে হযরত আবু তালহা (রা.) বলেন, আর এটি বুখারীর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের দিন ঠিক যুদ্ধের সময়ে তন্দ্রা আমাদের আচ্ছন্ন করে, আর এটি সেই তন্দ্রা যার উল্লেখ ইতঃপূর্বে করা হয়েছে। হযরত তালহা (রা.) বলেন, তরবারি আমার হাত থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হলেই আমি সেটি ধরে ফেলতাম। অতএব এইহাদীস বলছে, ঘুমের অবস্থা এমন ছিল না যে, হাত থেকে জিনিস নীচে পড়ে যাবে বা হাঁটতে হাঁটতে আমরা পড়ে যাব। প্রশান্তি ছিল, স্বস্তি ছিল, কিন্তু তবুও নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। অতঃপর পড়ে যাবার উপক্রম হলে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ফেলতাম। অর্থাৎ এই তন্দ্রাভাব হঠাৎ আসে নি, বরং এটি একটি পরিস্থিতি ছিল যা এসব মানুষের ওপর কিছুক্ষণ বিরাজমান ছিল।

তিরমিযীর তফসীর অধ্যায়ে হযরত আবু তালহা (রা.)-র পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে, উহুদের যুদ্ধের দিন মাথা উঁচু করে তাকালে প্রত্যেককে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে স্ব-স্ব ঢালের নীচে ঝুঁকতে দেখি। জেগে থাকার কারণে কিংবা ক্লান্তির কারণে এই সাহাবীরা ছিলেন অবসন্ন। এহেন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই প্রশান্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। দৃশ্যটি সার্বজনীন ছিল, এমন নয় যে হঠাৎ কোনো সৈন্যের ওপর চেপে বসা অবস্থা ছিল। বরং পুরো বাহিনী যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে শত্রুদের বিপরীতে অনড় ছিলেন, তাদের সবার ওপর মনে হলো যেন আকাশ থেকে একটি জিনিস অবতীর্ণ হয়েছে আর সে অবস্থা তাদেরকে আচ্ছন্ন করেছে। সেসময় তাদের নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে চনমনে করার, সেগুলোকে সতেজ করার জন্য এই প্রশান্তির ভীষণ প্রয়োজন ছিল আর সেটি ঘুমানোর সময় ছিল না। অবস্থা যখন এমন অর্থাৎ এমন ক্লান্তিকর অবস্থা হলে মানুষের ওপর এ ধরনের অবস্থা ছেয়ে যায়। যাহোক, গোটা জাতি যুদ্ধ চলাকালে যখন শত্রুর পক্ষ থেকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন, এমন ঘুমের ঘোরে চলে যাওয়া একটি মু 'জিযা যা কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়। কিছু মানুষের সাথে এমনটি হয়ে যায় কিন্তু এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় বরং একটি মু'জিযা, আর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ প্রশান্তি কর অবস্থা তাদেরকে সেসময় প্রদান করা হয়েছিল।

[দরসুল কুরআন, প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.), ৬ই রমযান, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪]

যুহরীর বরাতে আল্লামা আব্দুর রাজ্জাক রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.)-এর জ্যোতির্মণ্ডিত চেহারায় ওপর উহুদের দিন তরবারি দিয়ে সত্তরটি আঘাত করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা তঁ াকে (সা.) এসব অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছিলেন।ইবনে হাজর আসকালানী বর্ণনা করেন, হতে পারে যুহরী সত্তর বলতে প্রকৃত অর্থে সত্তরই বুঝিয়েছেন বা সত্তর বলে অগণিত বোঝাতে চেয়েছেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,যুদ্ধে তাকে সর্বাধিক সাহসী মনে করা হতো যে মহানবী (সা.)-এর পাশে থাকত, কেননা তিনি (সা.) অনেক ভয়াবহ স্থানে থাকতেন। সুবহানাল্লাহ্! কতই-না অতুলনীয় মর্যাদা। উহুদের প্রান্তরে দেখো! উপর্যুপরি তরবারির আঘাত আসে। এত তুমুল যুদ্ধ হচ্ছিল যে, সাহাবীরা সহ্য করতে পারছিলেন না; কিন্তু এই সাহসী পুরুষ বুক পেতে দিয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। এতে সাহাবীদের কোনো দোষ ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এতে এই রহস্য নিহিত ছিল, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

তিনি (আ.) বলেন, এক সময় উপর্যুপরি তরবারির আঘাত আসছিল আর তিনি (সা.) আল্লাহ্র নবী হওয়ার দাবি করছিলেন যে, আমি আল্লাহ্র রসূল মুহাম্মদ। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর কপালে সত্তরটি আঘাত লাগে, কিন্তু এসব আঘাত হালকা ছিল যা এক মহান ঘটনা ছিল।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৫)

মহানবী (সা.)-এর গর্তে পড়ে যাবার ঘটনা সম্পর্কে রেওয়ায়েত যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হলো, ফাসেকআবু আমের উহুদের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলো গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল যেন মুসলমানরা অজান্তে সেগুলোতে পড়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহানবী (সা.) অজান্তে সেগুলোর একটিতে পড়ে যান। তিনি অজ্ঞান হয়ে যান এবং তাঁর দুই হাঁটুতে আঘাত পান। হযরত আলী (রা.) ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হয়ে তাঁকে (সা.) ধরে ফেলেন এবং হযরত তালহা বিন উবায়দু ল্লাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-কে খাদ থেকে ওপরে তুলে আনেন। হতভাগা ইবনে কামিয়ার কারণে মহানবী (সা.) খাদে পতিত হয়েছিলেন, কেননা সে মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করে তরবারির আঘাত হেনেছিল। তরবারি তাঁর (সা.) ঘাড়ে এসে আঘাত হানে। তরবারির কোপ তাঁর (সা.) কোনো ক্ষতি করতে পারেনি,কিন্তু এর আঘাতের ফলে তাঁর পবিত্র ঘাড়ে এত তীব্র আঘাত আসে যে, এরপর এক মাস বা ততোধিক কাল পর্যন্ত তাঁর ঘাড়ে কষ্ট ছিল। একই সাথে সে পাথর ছুঁড়তে থাকে আর একটি পাথর এসে তাঁর পাঁজরে লাগে। অন্যদিকে উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস, যে কিনা হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-র ভাই ছিল, সে মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্যকরে একটি পাথর সজোরে নিক্ষেপ করে যা তাঁর (সা.) মুখে আঘাত হানে। এর ফলে তাঁর (সা.) নীচের মাড়ির সামনের দুটো দাঁত ও ছেদন দাঁতের মাঝের একটি দাঁত ভেঙে যায়। এরই সাথে নীচের ঠোঁট ফেটে যায়। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বর্ণনা করেন, দাঁতের একটি অংশ ভেঙে গিয়েছিল, মাড়ি থেকে উপড়ে যায় নি। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) যিনি এই উতবার ভাই ছিলেন, তিনি যখন জানতে পারেন যে, মহানবী (সা.)-কে আক্রমণকারী তার ভাই ছিল, তখন তিনি প্রতিশোধের নেশায় তার পশ্চাদ্ধাবন করে সৈন্যবাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তিনি বর্ণনা করেন, সেসময় তাকে হত্যা করার যে প্রবল বাসনা আমার মাঝে ছিল হয়তবা পৃথিবীর আর কোনো কিছুর প্রতি কখনো এতটা হয় নি। কিন্তু উতবা তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি (রা.) পুনরায় তার সন্ধানে যান, কিন্তু সে প্রতিবারই কৌশলে পালিয়ে যায়। তৃতীয়বার যখন যেতে উদ্যত হন তখন মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার কি মরার ইচ্ছা আছে? হযরত সা 'দ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এভাবে নিষেধ করায় আমি ক্ষান্ত হই। মহানবী (সা.) উতবা বিন আবী ওয়াক্কাসের বিরুদ্ধে এই দোয়া করেছিলেন যে, اَللّٰهُمَّ لَا يَحُوْلُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَتّٰى يَمُوْتَ كَافِرًا অর্থাৎ হে আল্লাহ্! এক বছর অতিবাহিত হওয়ার আগেই যেন সে কাফির অবস্থায় মারা যায়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) দোয়া এভাবে কবুল করেছেন যে, সে দিনই হযরত হাতেব বিন আবী বালতা (রা.) তাকে হত্যা করেন। হযরত হাতেব (রা.) বলেন, আমি যখন উতবা বিন আবী ওয়াক্কাসের লজ্জাজনক ধৃষ্টতা দেখলাম তখন চটজলদি মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করি, উতবা কোন্ দিকে গেছে? তিনি (সা.) সেদিকে ইশারা করেন যেদিকে সে গিয়ে ছিল। আমি সাথে সাথে তার পিছু ধাওয়া করি, পরিশেষে এক স্থানে তাকে ধরতে সক্ষম হই। আমি তৎক্ষণাৎ তার ওপর তরবারির আঘাত হানি যার ফলে তার মস্তক ছিন্ন হয়ে দূরে ছিটকে পড়ে। আমি অগ্রসর হয়ে তার তরবারি ও ঘোড়া হস্তগত করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে তা নিয়ে উপস্থিত হই। মহানবী (সা.) এই সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে দুই বার বলে ওঠেন, رَضِيَ اللّٰهُ عَنْكَ. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْكَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

এই আক্রমণের ফলে মহানবী (সা.)-এর মাথায় যে শিরস্ত্রাণ ছিল সেটিও ভেঙে যায়। এছাড়াও শত্রুর উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে তাঁর পবিত্র চেহারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় এবং চামড়া কেটে যায়। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার ওপর আক্রমণকারীদের মাঝে একজন ছিল আব্দু ল্লাহ্ বিন শিহাব যুহরী, পরবর্তীতে সে ইসলাম গ্রহণ করে।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭) (ফাতহুল বারি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৪, হাদীস-৪০৭০)

এর বিবরণ চলমান আছে, ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াতের স্মৃতিচারণ করতে চাই। প্রথম স্মৃতিচারণ মুকাররম আবু হিলমী মুহাম্মদ উকাশা সাহেবের। তিনি ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিলেন। শরীফ ওদে সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন, কিছুদিন পূর্বে গাজা এলাকার আমাদের আহমদী ভাই মুহাম্মদ উকাশা সাহেবকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে। তার শবদেহ তার বাড়ি اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ।

মরহুম পরম নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। নিজের পৈত্রিক গ্রাম থেকে হিজরত করে গাজার জাবালিয়ায় শরণার্থী শিবিরে থাকতেন। তার সাত পুত্র এবং পাঁচজন কন্যা আর পঁয়ত্রিশজন দৌহিত্র-দৌহিত্রি রয়েছে। তার একজন দৌহিত্র বলেন, কয়েক সপ্তাহ যাবৎ

তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। সাময়িক যুদ্ধবিরতির সময় তাকে খুঁজতে যাই কিন্তু তাকে ঘরে পাই নি। এরপর তার বাড়ি থেকে একশ' মিটার দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লাশের মধ্যে তার মরদেহ পাওয়া যায়। মাথায় গুলি করে তাকে শহীদ করা হয়।

গাজার একজন আহমদী ইয়াসির শাহীন সাহেব বলেন, মরহুম দশ বছর আগে ডিশ অ্যান্টেনা লাগিয়ে আমাকে বলেন, এমটিএ চ্যানেল খুঁজে পেতে আমাকে সাহায্য করো। তখন তার মাধ্যমে আমি আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারি। কিছুদিন পর তিনি আমাকে বিস্তারিতভাবে জামা'ত সম্পর্কে অবগত করেন এবং কিছু বই-পুস্ত ক পাঠিয়ে দেন। কিছুকাল আমাদের মাঝে ধর্মীয় বিতর্ক চলতে থাকে। এরপর আমি ইস্তেখারা করি এবং আমার স্ত্রীসহ বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করি। আমার বয়আত গ্রহণ করায় মোহাম্মদ উকাশা সাহেব ভীষণ আনন্দিত হন। এরপর আমাদের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। তিনি আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের তফসীর শোনাতেন। তফসীরে কবীর থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি পড়ে শোনাতেন এবং নাসেখ-মনসুখের মতো বিষয়াদি বুঝাতেন। তার কথা বলার ধরনখুবই চিত্তাকর্ষ ক ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ একটি পুস্তক রচনা করছিলেন আর আমাকে ডেকে উক্ত পুস্তক থেকে পড়েশোনাতেন এবং সেটিকে আরো পরিমার্জন করতেন আর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তার ইচ্ছা ছিল, তার বাড়িটি সম্প্রসারিত করে তাতে একটি লাইব্রেরি স্থাপন করবেন যেখানে তিনি জামা'তের বই-পুস্ত কের অনুলিপি রাখবেন। কিন্তু তার পরিবার আহমদীয়াতের কারণে তার প্রতি যুলুম-নির্যাতন করত তাই তার এই সদিচ্ছা পূর্ণ হয় নি। তার মাধ্যমেই গাজা জামা'তের সাথে আমার পরিচয় হয়। আমরা সবাই তার বৈঠকখানায় তার সাথে সাক্ষাৎ করতাম। তার জীবনের অন্তিম বছরগুলোতে অসুস্থতার কারণে তিনি প্রায়শই নিজের বাড়িতে থাকতেন এবং অতি কষ্টে হাঁটাচলা করতেন।

গাজার অপর একজন আহমদী ইয়ূজ সাহেব বলেন, মরহুম ছিলেন দীর্ঘকায়, শীর্ণদেহ এবং শুভ্র-শ্মশ্রুমণ্ডিত। তিনি যার সাথে কথা বলতেন স্বল্পতম সময়ে তার ওপর তার পুণ্য ও তাকওয়ার প্রভাব পড়ত। সর্বদা যিকরে ইলাহী এবং জামা'তের বইপুস্ত ক পাঠে ব্যস্ত থাকতেন। তার বড়ো আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তার বাড়ির পাশেই যেন জামা'তের একটি মসজিদ নির্মিত হয়। ২০১৪ সালের যুদ্ধের পর তিনি নিজের হাতে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন যাতে তিনি লেখেন, এমন একদিন আসবে যখন কবরগুলোর ওপর বোমা নিক্ষেপ করা হবে আর সেগুলোর ফলক ও পাথর এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়বে। পরবতীতে সত্যিই এমনটি হয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক সাক্ষাৎপ্রার্থীর সাথে হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি ছিলেন খুবই উদার, মেধাবী এবং অন্যের মনের কথা খুব দ্রুত পড়তে পারতেন।

জনাব ইউসুফ নামে একজন ডাক্তার সাহেব বলেন, ভাই আবু হিলমী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সত্যিকার আহমদী। আহমদী হওয়ার পূর্বেই তার চিন্তাধারা ও কার্যাবলি আহমদীসুলভ ছিল, তাই জামা'তের সুসংবাদ পাওয়া মাত্রই বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আত গ্রহণের পর তিনি মাশায়েখ ও আশপাশের লোকদের সাথে জামা'ত সম্পর্কে কথা বলতেন, ফলে তাকে নিজের আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে অনেক বিরোধিতা ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। শেষ বয়সে তিনি ক্রাচে ভর দিয়ে জুমুআ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে সর্বাগ্রে উপস্থিত হতেন, অথচ তার অনেক কষ্ট হতো এবং পথিমধ্যে বিরোধীদের কারণে বিপদের সম্মুখীন হতে হতো। দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও চাঁদা অন্যদের আগে দিতেন। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল জামা'ত ও এর দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত জগতে যেন বিজয় লাভ করে, কেননা এর মাঝেই রয়েছে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান। তিনি নিজের বাড়ি ও জমির একাংশ জামা'তকে প্রদান করার বাসনা রাখতেন যেন সেখানে জামা'তের মসজিদ ও জামা'তের কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে, কিন্তু তার বিরোধী আত্মীয়স্বজন এ কাজে অন্তরায় হয়। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান-সন্ততিকেও তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। তার সন্তানসন্ততি ও পরিবার যেন আহমদীয়াত ও প্রকৃত ইসলামকে অনুধাবন করতে পারে এবং শান্তি ও নিরাপত্তার মাঝে থাকতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। অত্যাচারীদের প্রতিহত করুন এবং অত্যাচারীদের নির্মূল করুন।

ইসরাঈল এখন লেবানন সীমান্তেও হিযবুল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করতে যাচ্ছে এবং এর ফলে অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে। অনুরূপভাবে আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যের ইয়েমেনের হুথি গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে- এ বিষয়গুলো যুদ্ধকে আরো বিস্তৃত করছে। এখন অনেক লেখক এটিও লিখছে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আভাস আরো সন্নিকট মনে হচ্ছে। কাজেই, অনেক দোয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন।

আরেকজন মরহুমার স্মৃতিচারণ রয়েছে। তিনি জার্মানির মুরব্বী সিলসিলাহ্ হায়দার আলী জাফর সাহেবের স্ত্রী إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । আল্লাহ্র কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। তার নানা হযরত চৌধুরী আমীনুল্লাহ্ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। হায়দার আলী জাফর সাহেব লিখেছেন, আমি মুরব্বী হিসেবে কর্মক্ষেত্রে ছিলাম। বিভিন্ন সময়ে প্রায় বারো বছর তিনি একা ছিলেন, কিন্তু কখনো কোনো অভিযোগ করেন নি। একবারের ঘটনা, কোনো বিষয়ে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। যখন আমি জিজ্ঞেস করি, আমাকে পূর্বে কেন বলো নি? তখন তিনি বলেন, না বলার কারণ হলো কর্মক্ষেত্রে কাজে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে। তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টের বাইতুস্ সুবুহ্ হালকার প্রেসিডেন্টও ছিলেন। খিলাফত জুবিলীর বছর ফ্রাঙ্কফুর্টে লাজনার সদর হিসেবে কাজ করার সুযোগও পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে নামায রোযায় খুবই অভ্যস্ত ছিে লন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন, কুরআন তেলাওয়াত করতেন, অনেক দান-সদকা করতেন ও যথাসময়ে চাঁদা পরিশোধ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

পরবতী স্মৃতিচারণ ঘুটিয়ালিয়ার হাবিবুল্লাহ্ কাহলুন সাহেবের স্ত্রী নাসিম আখতার সাহেবার যিনি অতি সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। মৃত্যুয় সময় ওসীয়্যতের সব হিসাব পরিষ্কার ছিল। জীবদ্দশাতেই হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। তিনি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও ছয়জন ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। এক মেয়ে তার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সন্তানদেরকেও খুব স্নেহ-ভালোবাসার সাথে রেখেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন। ছেলেদের মধ্যে চারজন ওয়াকেফে যিন্দেগী। তার এক ছেলে নাভিদ আদিল সাহেব লাইবেরিয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ্ ও মিশনারী ইনচার্জ, যিনি কর্মক্ষেত্রে থাকায় তার মায়ের জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। তিনি বলেন, তার পরিবারে তার পিতা মওলা বখ্শ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত আসে যিনি দ্বিতীয় খলীফার যুগে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তার ধর্মীয় জ্ঞান খুবই ভালো ছিল। কখনো কখনো সাক্ষাৎকারীরা তাকে জিজ্ঞেস করত, আপনি কতদূর পড়াশুনা করেছেন? তার জাগতিক পড়াশোনা খুব নগণ্য ছিল। ধর্মীয় জ্ঞানের আগ্রহের ব্যাপারে প্রায়ই বলতেন, এটি তার মরহুম পিতার কারণে। কেননা তিনি দরস প্রভৃতি যা-ই মসজিদে শুনে আসতেন, ঘরে এসে আমাদেরকে অবশ্যই বলতেন। সুতরাং ঘরে যদি এরূপ ধর্মীয় আলোচনা হয় তবে (সন্তানদের ওপর) পিতামাতার সুপ্রভাব পড়ে। জামা'ত ও খিলাফতের সাথে তার সুগভীর ভালোবাসা ছিল। একান্ত নিভীক এবং ধর্মীয় আত্মাভিমানের অধিকারিনী ছিলেন। জামা'ত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার কথা সহ্য করতে পারতেন না। নিয়মিত নামায পড়তেন, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন এবং নিয়মিত ইতিকাফে বসতেন, কেবল শেষ কয়েক বছর ব্যতীত। রমযানে তিন-চার বার পবিত্র কুরআন খতম দিতেন। চলাফেরার মাঝে দরূদ শরীফ ও যিকরে এলাহীতে রত থাকতেন। একবার অকস্মাৎ পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙে যায়। আর তখন তার এক পুত্র (পত্র লেখক আদিল সাহেবের ছোট ভাই - অনুবাদক) সেখানে ছিলেন। ঠিক তার ফেরত আসার দিনই তিনি পড়ে যান আর পা ভেঙ্গে গেলে তিনি তাকে বলেন, তুমি তোমার ডিউটিতে যাও! অতঃপর তিনি পার্শ্ববতী গ্রাম থেকে তার জামাতাকে ডেকে পাঠান, তার সাথে হাসপাতালে যান এবং তিনি তার পুত্রকে বলেন যে, ধর্মের সেবায় তৎক্ষণাৎ রওয়ানা দেওয়া তোমার কর্তব্য।

নাভিদ আদিল সাহেবও বলেন, সাত বছর পরে ছুটিতে (বাড়ি গেলে) তার সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি উপদেশ দেন যে, জীবন-মৃত্যু আল্ল াহ্র হাতে। কেউ জানে না, কখন কার সময় আসে। তাই যদি এমন সময় আসে তবে তুমি কখনো তোমার ডিউটি রেখে আসবে না, সেখানেই অবস্থান করবে যেখানে তুমি থাকবে। এজন্যই তিনি তার সেন্টারে বা কর্মস্থলেই ছিলেন। তিনি তার মায়ের জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।

পরবতী স্মৃতিচারণ বশীরাবাদ স্টেটের রশীদ আহমদ যমীর সাহেবের সহধর্মিনী মুকাররমা মুবারাকা বেগম সাহেবার। তিনিও কয়েক দিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তার শ্রদ্ধেয় পিতা বাহাওয়াল হক সাহেবের মাধ্যমে পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে ১৯৪৮ সালে বয়আত করেছিলেন। তিনি অসংখ্য চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারিনী ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তাহাজ্জুদে নিয়মিত, জামাতের একজন নিঃস্বার্থ সেবিকা,

এরপর ৮এর পাতায়....

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 15-22 Feb, 2024 Issue No. 7-8

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs.12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সর্বশক্তিমান খোদা যিনি পরম দয়ালু ও বার বার কৃপাকারী, আমাকে তাঁর ইলহামে সম্বোধন করে বলেছেন:

"আমি তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী- তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার কান্না শুনেছি। এবং তোমার দোয়াসমূহকে অনুগ্রহ করে কবুল করেছি, বরং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানা) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি।

"সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছো। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যারা জীবন-প্রত্যাশী, তারা যেন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে, যাতে ইসলামের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হয় এবং সত্যতার যাবতীয় আশিসসমূহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কিতাব এবং তাঁর রসূলে পাক মহম্মদ (সাঃ) কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে, তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন পায় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়। "সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর এক সুদর্শন এবং পবিত্র-পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই সন্তান হবে।"

"সুশ্রী, পবিত্র-পুত্র তোমার মেহমান আসছে। তার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদদাতাও বটে। তাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হয়েছে। সে কলুষ থেকে পবিত্র। সে আল্লাহর নূর। ধন্য সে, যে আকাশ থেকে আসে। তার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে বৈভব, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে এবং তার সঞ্জীবনী-শক্তি ও পবিত্র আত্মার প্রসাদ বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করবে। সে 'কালিমাতুল্লাহ্'- আল্লাহ্তা'লার বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান' এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝি নি) সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয়-পুত্র।

مَظْهَرُ الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ - مَظْهَرُ الْحَقِّ وَ الْعَلَاءِ - كَاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ "অর্থাৎ সত্যের বিকাশ স্থল ও সুউচ্চ, যেন আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার আগমন বিশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে নিজ আত্মা দান করব এবং খোদার ছায়া তার মাথায় থাকবে। সে শীঘ্রই বর্ধিত হবে, বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিরা তার কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে।

وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا অর্থাৎ এটাই আল্লাহর অটল মীমাংসা"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir